শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মোতাহারী

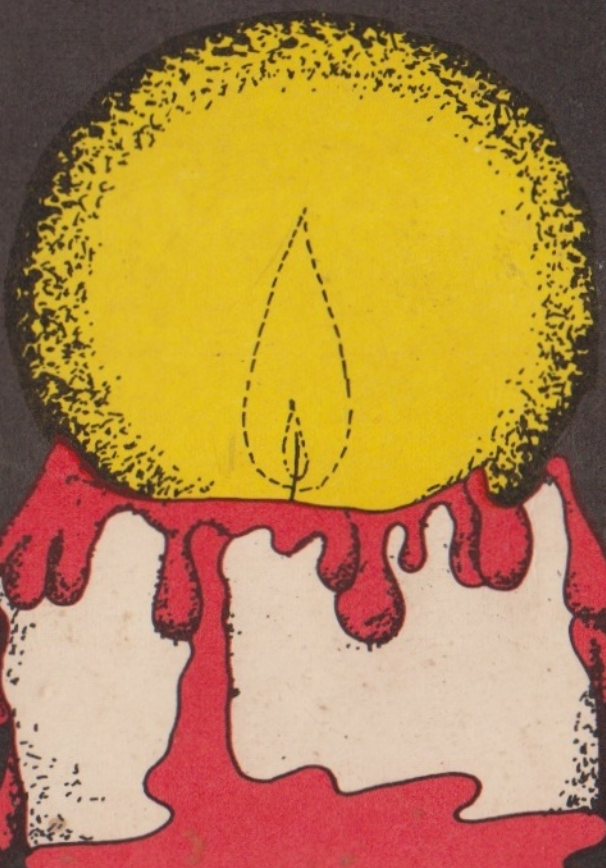

শহীদ

শহীদ

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মোতাহারী

অনুবাদ
আহমদ ইয়াহিয়া খালেদ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মূল : শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারী
অনুবাদ : আহমদ ইয়াহিয়া খালেদ

প্রকাশক
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
১৮ই আগষ্ট, ১৯৮৪

মুদ্রণে :
তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
২৩, রবীন্দ্রনাথ বসাক লেন, (টিপু সুলতান রোড)
ঢাকা, বাংলাদেশ ।

ফোন : ২৩৯৪১৫
২৫১৬৯৪

Bengali version of Martyr Professor Ayatullah Mortaza Motahari's book Martyr Published by the Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran.

CWM (A) 12, Kamal Ataturk Avenue, Gulshan, Dhaka, Bangladesh.
Phone : 601096 601432.

www.pathagar.com

সূচী

চিরঞ্জীব শহীদ মোতাহারী	৫
শহীদ মোতাহারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী	৬
ভূমিকা	১২
আল্লাহ্‌র নৈকট্যে শহীদ	১২
শহীদের বিশেষ অধিকার	১৩
কেন পবিত্র ?	১৫
জিহাদ বা শহীদের দায়িত্ব	১৭
শাহাদাতের আকাঙ্খা	২১
শহীদের প্রেষণা	২৫
শহীদের খুন	২৬
শহীদের সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপনা	২৬
শহীদের অমরত্ব	২৬
শহীদের সুপারিশ	২৭
শহীদের জন্যে বিলাপ, শোক প্রকাশ	২৮
শাইয়েদুশ শোহাদার সাক্ষ্য	৩৮
ইমাম খুশী হলেন	৪১
সবাই একই সুরে	৪১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

চিরঞ্জীব শহীদ মোতাহারী

অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মোতাহারীর শাহাদাতের পর চারটি বছর অতিক্রান্ত হলো। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের প্রায় তিন মাস অতীত হবার পর ১৯৭৯ সালের ১লা মে এই মহান সাধকের শাহাদাতের মর্মন্তুদ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চরেরা বিপ্লব পূর্বকালের এ মহান চিন্তাবিদ ও দার্শনিককে শহীদ করার মাধ্যমে বিপ্লবের মনীষাকে নস্যাৎ করার জন্যে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই করেছিল। তাদের সে পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। কারণ আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মোতাহারীর যে মনীষা ও বুদ্ধিমত্তা তাঁর জীবদ্দশার চেয়ে শাহাদাতের পরে আরো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর এ কারণেই ইসলামের ইতিহাসের যে কোন গ্রন্থকারের তুলনায় তাঁর গ্রন্থগুলো আজ সর্বত্র বিপুলভাবে পঠিত হচ্ছে।

ইসলামী চিন্তাধারা এবং দর্শনের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যেই মোতাহারী তাঁর কলম ধরেছিলেন এবং তিনি ইরানের নতুন বংশধরদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত করেছিলেন যে, তাতে করে তারা বিপদগামী আদর্শ ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সক্ষম হয়। এতদ্ভিন্ন দেশের যুব শক্তিগুলো যাতে ইসলামের মহান শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তিগুলো আত্মস্থ করতে পারে সে জন্যে তিনি বিরামহীন চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

শহীদ মোতাহারী ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান লোক। তবে তিনি তাঁর সে প্রতিভাকে শুধুমাত্র তত্ত্বগত ও শিক্ষায়তনগত পরিমন্ডলেই নিয়োজিত রাখেননি—যা জনগণের উপর কোন প্রকার প্রভাব ব্যতিরেকে শুধু কোন মহান ব্যক্তিত্বের জন্যে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। তিনি ছিলেন সরল-সহজ প্রকাশভংগির অধিকারী। তবে তাতে তাঁর চিন্তার গাম্ভীর্য আদৌ ক্ষুন্ন হতো না। এমনকি যুক্তির যথার্থতা বিসর্জন না দিয়ে এবং কোন প্রকার কূটযুক্তি তথা অর্থহীন বাগাড়ম্বরপূর্ণ উক্তি ও কাব্যিক সুর সংযোজন ব্যতিতই তিনি তাঁর সরল-সহজ বক্তব্যকে পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন। মোটকথা, ইসলামের মহান ব্যক্তিগণ দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে যেসব গুণাবলীর অধিকারী হয়েছেন

www.pathagar.com

তিনিও সে সব গুণের অধিকারী ছিলেন। শহীদ মোতাহারী তাঁর যুগের যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন পূরণ করার মতোই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তাঁর গ্রন্থগুলো আজ সর্বস্তরের লোকেরাই পাঠ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে বিদগ্ধ পন্ডিত সমাজ আজ তাঁর গ্রন্থের সমজদার পাঠক। আর তারা সকলেই তাদের স্ব স্ব মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সে সব গ্রন্থ থেকে অফুরন্ত ফায়দা গ্রহণ করছেন। তাঁর গ্রন্থগুলো পাঠ করা মাত্র যে কোন চিন্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন—আর এটাই হচ্ছে তাঁর লেখার বিশেষত্ব। আমরা মনে করি তাঁর সমুদয় লেখা বিদেশী ভাষাসমূহে অনূদিত হওয়া প্রয়োজন—যাতে ফার্সী ভাষাভাষী নন এমন সব মুসলিম ভাইয়েরাও তাঁর জ্ঞান ও চিন্তাধারার সারবত্তা, মৌলিকতা এবং ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন।

মোল্লা সদরের ইন্তেকালের পর (১০৫০ হিঃ) দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কম-বেশী ইসলামী দর্শন জড়তাগ্রস্ত থাকার পর শহীদ মোতাহারীর লেখনী শক্তির মাধ্যমেই ইসলামী দর্শন ও চিন্তাধারা আধুনিক ধারায় প্রবেশ করে এবং একটি সতেজ ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ লাভ করে। তিনি ইরানে এবং শহীদ বাকের আল সদর ইরাকে মার্কসবাদের অসার যুক্তিগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা সাধারণভাবে ইউরোপের আধুনিক দর্শনের গোলমেলে অগ্রগতি এবং বিশেষ করে মার্কসবাদের মোকাবিলায় ইসলামী দর্শনের অকাট্য ও অপ্রতিহত প্রাধান্য এবং এর আবশ্যিক পবিত্রতা ও সংহতিকে প্রতিষ্ঠা করেন—যা প্রকৃতপক্ষে একটি অতি প্রাকৃতিক ও জগা-খিচুড়িপূর্ণ ঘোলাটে দর্শন এবং যাকে প্রতারণাপূর্ণভাবে 'বৈজ্ঞানিক' এই লেবেল দ্বারা বাজারজাত করানো হয়েছে।

শহীদ মোতাহারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শহীদ মুর্তাজা মোতাহারী ১৯১৯ সালের (হিঃ ১৩৩৮) ২রা ফেব্রু-য়ারী খোরাসান প্রদেশের ফারিমান নামক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ হোসাইন মোতাহারী ছিলেন সে যুগের একজন মস্তবড় সাধক ব্যক্তি ও আলেম। ফারিমানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ-সান্তে ১২ বছর বয়সে তিনি মির্জা মেহেদী শহীদী রেজাভীর অধীনে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে মাশহাদের ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রে গমন করেন। অতঃপর আয়াতুল্লাহ্ বুরুজারদী, ইমাম খোমেনী ও অন্যান্য মহান শিক্ষক ও চিন্তা-বিদদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি কোমে গমন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। হাজী মির্জা আলী আগা শিরাজীর

www.pathagar.com

সাথে পরিচিতি তাঁর চিন্তাধারায় বিপুল পরিবর্তন ও প্রভাব ঘটায়। এই সময় শহীদ মোতাহারী ইসলামী দর্শনশাস্ত্রে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহ তথা 'ইলমে অসুল' এবং ইসলামী আইন বা ফিকাহ্, এই উভয়বিধ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে ইসলামী দর্শনশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন। ঠিক এই সময়ই তিনি কোমের ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রে একজন অন্যতম মেধাবী ছাত্র হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন। শুধু তাই নয়, তিনি ইমাম খোমেনীর একজন অতিশয় প্রিয় ও স্নেহভাজন ছাত্র হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।

অধ্যাপক মোতাহারী আয়াতুল্লাহ্ মুহাক্কিক, আগা মেহেদী মির্জা আশতিয়ানী, আল্লামা তাবাতাবায়ী এবং আয়াতুল্লাহ্ বুরুজারদীর মতো মহান শিক্ষকদের অধীনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। আর এ ভাবেই তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনে ব্রতী হন। তাঁর সুযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে আর যাঁদের নামোল্লেখ করা যায়, তাঁরা হলেন আয়াতুল্লাহ্ ইয়াসবেরী কাশানী, আয়াতুল্লাহ্ খোনছারী এবং আয়াতুল্লাহ্ সদর।

উপরে উল্লেখিত তাঁর এ বিদ্যাভ্যাস থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে, মাশহাদে থাকাকালীন সময়ে তথা যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি ইসলামী দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে অতীতের সে দিন-গুলোর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন: মাশহাদে আমি যখন আরবী ভাষা শিক্ষা শুরু করেছিলাম তখন থেকেই আমি আমার অতীতের কথাটা স্মরণ করতে পারি। আমি যদিও মহান দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের দর্শন সম্পর্কে খুব একটা পরিচিত ছিলাম না, তথাপি আমি তখন থেকেই তাঁদের পান্ডিত্য ও দর্শনের বিশেষ মূল্য দিতে শুরু করি। সুতরাং আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, অনুসন্ধানী ও বিজ্ঞানীদের তুলনায় আমি তাদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠি। আর এ কারণেই আমি তাদেরকে পৃথিবীর চিন্তারাজ্যের নায়ক বলে মনে করতে লাগলাম।

আমরা অনায়াসে জানতে পারি যে, কোমে ইমাম খোমেনী এবং পরবর্তী পর্যায়ে ইমাম তাবাতাবায়ীর মতো সুযোগ্য উস্তাদদের অধীনে দীর্ঘ ১৫ বছরকাল অধ্যয়নের পূর্বেই অধ্যাপক মোতাহারী দর্শনশাস্ত্রের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইমাম খোমেনীর নিকট দর্শনশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করা ছাড়াও তিনি ইমামের 'আখলাক শীর্ষক' ক্লাস-গুলোতে নিয়মিত যোগদান করতেন। এতে মনে হচ্ছে যে, এসব বক্তৃতামালা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি নিজেই ইমাম খোমেনীর সে সব বক্তৃতার কথা এইভাবে স্মরণ করেছেন: নীতিজ্ঞান

www.pathagar.com

তথা আখলাক সম্পর্কে প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক (ইমাম খোমেনী) যেসব বক্তৃতা দিতেন আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে তা বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের কাজ করতো। তিনি কোন নির্জীব নীতিশাস্ত্রের শুষ্ক পাঠ আমাদেরকে দিতেন না। তাঁর সে শিক্ষাদান আমাকে এমনিভাবে এবং এতোটা আকৃষ্ট করতো যে, আমি অলক্ষ্যেই যেন তাঁর প্রভাবাধীন হয়ে পড়তাম এবং পরবর্তী সোম ও মঙ্গলবার পর্যন্ত তা আমার হৃদয়পটে স্থায়ী হয়ে থাকতো। আমি এই আধ্যাত্মিক শিক্ষকের নিকট দীর্ঘ ১২ বছর পর্যন্ত যে সব বক্তৃতার ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেছিলাম আমার আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের অধিকাংশ ফসল গুলো তাঁরই ফলশ্রুতি। আমি সব সময়ই আমাকে তাঁর নিকট ঋণী বলে মনে করতাম।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকাল। মোতাহারীর জীবনে একটি ঘটনা ঘটে গেল। পরবর্তী পর্যায়ে এই ঘটনাই তাঁকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে রূপায়িত করে। আর এই ঘটনাটি হচ্ছে মরহুম হাজী মির্জা আলী শিরাজী ইস্পাহানীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই তিনি 'নাহজুল বালাগা'র প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। 'নাহজুল বালাগা' হচ্ছে হযরত আলীর (রাঃ) বক্তৃতা, পত্রাবলী ও বাণীসমূহের একটি সংকলন। 'নাহজুল বালাগা'র প্রতি তাঁর এই পরিচিতি তাঁর জন্যে বিশেষ উপকারী হয়েছিল। এই সময় তিনি এই গ্রন্থ এবং এর বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নাহজুল বালাগার মধ্যে ভ্রমণ নামক গ্রন্থটি হচ্ছে তাঁর কাজের একটি অংশবিশেষ যা তিনি আরো বর্ধিত কলেবরে বের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে সক্ষম হননি।

১৯৪৭ সালের কথা। বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি পড়াশুনো শুরু করেন। যেহেতু দর্শনশাস্ত্রে এমনিতেই তাঁর আগ্রহ ছিল, তাই তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে এই বস্তুবাদী দর্শনের উপর অধ্যয়ন শুরু করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর এ পড়াশোনো অব্যাহত রাখেন। তবে তিনি সিয়ামের আধ্যাত্মিক দর্শনের উপর যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তা ছিল তুলনাহীন। বিশেষ করে মোল্লা সদরের দর্শনের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। একদিকে ইসলামী দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন তাঁকে একটি তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টির ব্যাপারে সক্ষম করেছিল—যে সম্পর্কে পূর্ব থেকে তাঁর নিকট কোন নজীর বা দৃষ্টান্ত ছিল না। অবশ্য তাঁর পূর্বেই আল্লামা তাবাতাবায়ী

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সমালোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। আর তাঁর এ কাজটাই পরবর্তী সময়ে তাঁর বিজ্ঞ ছাত্রগণ একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৫১ সালের কথা। আল্লামা তাবাতাবায়ী তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্রের পাঠদান শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত এসব ক্লাসে উস্তাদ মোতাহারী, শহীদ ডঃ আয়াতুল্লাহ্ বেহেশতী, শহীদ ডঃ বাহোনার এবং আরো অসংখ্য ছাত্র অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উস্তাদ মোতাহারী এসব বক্তৃতা একটি সংকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন, যার নাম দেয়া হয়েছিল 'প্রকৃত দর্শনের মূলনীতি ও প দ্ধতি।' তিনি এই সংকলনটিতে অনেক পাদটীকাও সংযোজিত করেছিলেন—যা আল্লামা তাবাতাবায়ী গ্রন্থের কলেবর থেকে পাঁচগুণ বড়।

কোমে অধ্যয়নকালে ইরানী সমাজের কতিপয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আর এটাই স্বাভাবিক যে, তাঁর মতো একজন ব্যক্তিত্বের পক্ষে ইরান তথা মুসলিম বিশ্বের এ দুরবস্থা অবলোকন করে উদাসীন ও চুপ থাকা সহজ নয়। ইরানসহ মুসলিম জাহানের এই করুণ অবস্থা তাঁকে বাধ্য করেছিল মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের উপর কতিপয় গ্রন্থ রচনা করতে। গ্রন্থ রচনার কথা বাদ দিলেও তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শিক্ষক এবং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন বক্তা ও বাগ্মী। একাধারে তাঁর লেখা ও বক্তৃতা ইরানের নব্য বংশধরদের চিন্তার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং পাহলভী বংশের নতুন ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধ্বংসাত্মক ও বিশৃংখল সামাজিক পদ্ধতির অসারত্বগুলো খন্ডন করে—যা মূলত দেশ থেকে ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে বিতাড়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল।

১৯৫৩ সালের দিকে অধ্যাপক মোতাহারী তেহরান গমন করেন এবং খোরাসানের একজন প্রসিদ্ধ আলেমের কন্যাকে বিয়ে করেন। এর এক বছর পরে তথা ১৯৫৪ সালে তিনি আল্লামা তাবাতাবায়ীর বক্তৃতামালা 'প্রকৃত দর্শনের মূলনীতি ও পদ্ধতি' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে তাঁকে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ সেখানে শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময় তিনি ইরানী সমাজের নব্য বংশধরদের নিকট সুযোগ্য ও মহান শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ধর্মীয় বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সাথে—যারা বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ ও বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং আদর্শ ও

www.pathagar.com

চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন, যোগাযোগের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সমরক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৯৫৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে এমনকি তার পরেও মুসলিম ডাক্তারদের সমিতি কর্তৃক বক্তৃতা দানের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। এই সময়ে রচিত তাঁর গ্রন্থগুলো মূলত সে সব বক্তৃতাকে ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান ও উপস্থিতি তাঁকে কোমের ধর্মকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম করেছিল। কোমের এই বিশ্ববিশ্রুত ধর্মকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ ও যোগসূত্র রচনায় মোতাহারী কঠোর পরিশ্রম করেন। এই ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত ইসলামী বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার জন্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক ছাত্র ও গ্রাজুয়েটকে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছুসংখ্যক মার্কসবাদীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে তিনি মার্কসবাদের অবিজ্ঞানিকতা ও ভ্রম সম্বন্ধে কলম ধরতে বাধ্য হন। ধর্মীয় ও দার্শনিক মতামত এবং যুক্তিতর্ক শোনা ও বোঝার ব্যাপারে তাঁর অপরিসীম দক্ষতা ছিল। তাই তিনি তাঁর গ্রন্থাবলীতে প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কগুলোর বিরুদ্ধে সমালোচনা করার পূর্বে সেগুলোকে যথার্থ ও সুন্দররূপে বর্ণনা এবং মূল্যায়ন করার প্রয়াস পান।

শাহের নব্য ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ১৯৬৩ সালের ৫ই জুন যে রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, ঠিক তখন থেকেই উস্তাদ মোতাহারীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ উন্মেষ ঘটে। সেই সময়কার সকল ঘটনাচক্রে মুসলিম চিন্তাবিদগণ ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময় তাদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। উস্তাদ মোতাহারীও গ্রেপ্তার হন এবং ৫ই জুনের মধ্যরাতে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। এরপর জনগণের অব্যাহত চাপ ও আলেম সমাজের প্রচেষ্টায় তিনি কারামুক্ত হন।

ইমাম খোমেনী তখন জেলে। জনগণ তাদের প্রিয় নেতার সান্নিধ্যে এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হলো। ঠিক এই সময় অধ্যাপক মোতাহারী ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবের সুকঠিন দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে তুলে নেন।

১৯৬৪ সালের কথা। ইমাম খোমেনীকে তুরস্কে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ইরানের আলেম সমাজ তখন তাদেরকে সুসংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত। পরিশেষে তারা ইসলামী চিন্তাবিদ এবং আলেমদের সমন্বয়ে একটি বিপ্লবী ও জেহাদী মোর্চা গঠন করেন। আর ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে মোতাহারী

www.pathagar.com

এই বাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হন। অতঃপর ১৯৬৪-১৯৭৭ পর্যন্ত ইসলামী বিপ্লবী বাহিনীকে একনায়ক পাহলভী প্রশাসনের বিরুদ্ধে যে মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় উস্তাদ মোতাহারী সে বিপ্লবী বাহিনীকে পরিচালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আসলে ইমাম খোমেনীই তাঁকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

১৯৭৮ সাল। বিপ্লবের অগ্নিশিখা তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। এই সময় মোতাহারীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দৃঢ়তার সাথে নেতৃত্ব দেন। আর এই সময়ই তিনি ইমাম খোমেনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে প্যারিস গমন করেন। প্যারিসে অবস্থানকালে ইমাম খোমেনী তাঁকে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের পরামর্শ দেন। ইমামের তেহরান প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর সান্নিধ্যেই অবস্থান করেন এবং তাঁর একজন উপদেষ্টা হিসেবে সক্ষম সহায়তা করেন।

১লা মে ১৯৭৯। গভীর রাতে উস্তাদ মোতাহারী তাঁর এক বন্ধুর বাসা থেকে, গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক শেষে ঘরে ফিরছিলেন। ফেরার পথে 'ফোরকান' নামে একটি খোদাদ্রোহী তথা নাস্তিক গ্রুপের জনৈক সদস্য তাঁর উপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং তাঁকে হত্যা করে।

উস্তাদ মোতাহারী শাহাদত বরণ করলেন। কিন্তু ইসলামের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে যে অনলস কর্মপ্রবাহ রেখে গেছেন তা তাঁকে যুগ যুগ ধরে চিরঞ্জীব করে রাখবে। সবচেয়ে বড় কথা—ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর যে স্বপ্ন তা তাঁর জীবদ্দশায়ই সাফল্য অর্জন করে এবং তিনি তা দেখে যেতে সক্ষম হন। তাঁর শহীদী আত্মা চির শান্তিতে থাকুক।

www.pathagar.com

ভূমিকা

সচরাচর ব্যবহারে বিশেষত ইসলামী পরিভাষায় কতগুলো শব্দ ও বাচন-ভংগীর সাথে কিছু মর্যাদা এমনকি পবিত্রতার ভাব বা আমেজ জড়িত থাকে।

ছাত্র, শিক্ষক, পন্ডিত, উদ্ভাবক, বীর, সংস্কারক, দার্শনিক, জাকির (ধর্মপ্রচারক), মুমিন (বিশ্বাসী) জাহিদ (ধার্মিক) মুজাহিদ, সিদ্দিক (সত্য-বাদী), অলী (দরবেশ), মুজতাহিদ, ইমাম, নবী-রসুল হচ্ছে এ ধরনের কয়েকটি শব্দ। সাধারণভাবে বিশেষত ইসলামী পরিভাষায় সম্মান, মর্যাদা ও পবিত্রতার ভাবধারা এসব শব্দের উপর আরোপ করা হয়।

এটা সুস্পষ্ট যে কোন শব্দের বিশেষ কোন পবিত্রতা থাকে না। শব্দের মাধ্যমে যে ভাবধারা প্রকাশ করা হয়, তার কারণেই শব্দটি পবিত্র হয়ে ওঠে।

জনগণ সাধারণভাবে অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত জনসমষ্টি তাদের বিশেষ কোন মানসিক দৃষ্টিভংগী বা লালিত মূল্যবোধের কারণে এ সব শব্দের সাথে পবিত্রতা বা মর্যাদা জুড়ে দেয়।

ইসলামী পরিভাষায় এমন একটি শব্দ আছে যা বিশেষভাবে পবিত্র অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী প্রকাশভংগীর সাথে পরিচিত কোন ব্যক্তি যখন এ শব্দটি শুনে, তখন তার কাছে এ শব্দটি বিশেষ গৌরব মন্ডিত। যারাই এ শব্দটি ব্যবহার করে তাদের কাছে এ শব্দটি একটি মহনীয়তা ও পবিত্রতার ভাবধারা প্রকাশ করে। অবশ্য এর মানদন্ড-মর্যাদা ও বিচারের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বর্তমানে আমরা ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে ব্যবহার নিয়েই আলোচনা করব।

ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে আমরা কেবলমাত্র সে ব্যক্তিকেই শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত বলে গণ্য করতে পারি, যিনি তাঁর কাজকর্মে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী উৎরে গেছেন বলে ইসলাম স্বীকার করে। যিনি ইসলামের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হাসিল করার জন্যে প্রাণ বিলিয়ে দেন এবং মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের আকাংখা দ্বারা যথার্থই উদ্বুদ্ধ হন তিনিই এ মর্যাদা লাভ করেন। মানুষের আকাংখার জগতে মর্যাদা ও সম্মান হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। শহীদ শব্দটির ওপর মুসলমানেরা এত বেশী পবিত্রতা আরোপ করেছেন কি কারণে এবং তার পেছনে যুক্তিই বা কি তা পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি।

আল্লাহ্‌র নৈকট্যে শহীদ

পবিত্র কুরআন শহীদের আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে, 'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হন, তাঁদের তোমরা মৃত ভেবো না,

www.pathagar.com

তাঁরা জীবিত, আপন প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত' (সূরা আলে ইমরান, ১৬৯ নং আয়াত)।

ইসলামী আদর্শে যখন কোন গুণবান ব্যক্তির বা তার প্রশংসনীয় কাজের উচ্চ প্রশংসা করা হয়, তখন বলা হয় যে, সে ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা হাসিল করেছেন অথবা সে নির্দিষ্ট কাজটি শাহাদাতের পুরস্কার লাভের যোগ্য। একজন ছাত্রের বিষয়, আমরা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি। বলা হয়েছে সত্যের অন্বেষায় ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের আশায় যদি তার জ্ঞান-সাধনা পরিচালিত হয় এবং যদি জ্ঞানার্জনকালে তার মৃত্যু হয় তাহলে সে মৃত্যু হবে শহীদের মৃত্যু। এ প্রকাশভংগীর মাধ্যমে একজন ছাত্রের উচ্চ মর্যাদা ও পবিত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। একইভাবে বলা যায় কোন ব্যক্তি যদি তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে কষ্ট ভোগ করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে সে যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রামরত একজন মুজাহিদ। উল্লেখ্য যে, ইসলাম আলস্য, জড়তা ও পরজীবী জীবনধারার ঘোরতর বিরোধী। কঠোর পরিশ্রম ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কর্তব্য।

শহীদের বিশেষ অধিকার

যারা মানবজাতির সেবা করেছেন কোন না কোন উপায়ে—পন্ডিত, দার্শনিক, উদ্ভাবক বা শিক্ষক হিসেবে তাঁরা মানুষের কৃতজ্ঞভাজন। কিন্তু একজন শহীদ এর যতটুকু হকদার, ততটুকু আর কেউ নন। এই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনে তাঁদের জন্যে একটি আবেগাপ্লুত অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মানবতার আর যতো সেবক আছেন তাঁরা সবাই শহীদদের কাছে ঋণী। কিন্তু শহীদরা তাঁদের কাছে ঋণী নন। একজন পন্ডিত, একজন দার্শনিক, একজন উদ্ভাবক, একজন শিক্ষক—এদের সবারই কাজের জন্যে, অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। একজন শহীদ তাঁর চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে সে পরিবেশ সৃষ্টি করে যান।

একটি মোমবাতির সাথে তাঁর তুলনা করা চলে। মোমবাতির কাজ হচ্ছে পরের কল্যাণে আলো জ্বালাতে গিয়ে নিজে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। শহীদরা হচ্ছে সমাজের মোমবাতি। তাঁরা নিজেদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমাজকে আলোকিত করে। তাঁরা যদি আলো না ছড়ান তাহলে কোন প্রতিষ্ঠানই আলোকিত হবে না।

যে কোন মানুষ দিনের বেলা সূর্যের আলোকে এবং রাতে প্রদীপ বা মোমবাতির আলোতে কাজ করে। সব দিকেই তার দৃষ্টি থাকে, কিন্তু তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না আলোর উৎসের প্রতি। অথচ এটা বলাবাহুল্য

www.pathagar.com

যে, আলো ব্যতিরেকে সে কিছুই করতে পারঙ্গম নয়। শহীদরা হচ্ছেন সমাজের জন্যে প্রদীপ। স্বৈরাচার ও নির্যাতনের অন্ধকারে তারা দীপ না জ্বালালে মানবতা প্রগতির সাথে এগিয়ে যেতে পারত না মোটেই।

আল-কুরআনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঐশী গ্রন্থে তাঁকে উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রজ্জ্বলিত হওয়া ও আলোকিত করা—এ উভয় অর্থই এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। আল-কুরআন বলেন, "হে নবী, আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে (সূরা আল-আহযাব, ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াত)।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী পরিভাষায় 'শহীদ' একটি পবিত্র শব্দ এবং যারা ইসলামী অভিধান বা শব্দ তালিকা ব্যবহার করেন এটা তাঁদের জন্যে যে কোন শব্দের চাইতে উচ্চতর অর্থবহ।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে আইনগত ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ইসলামী আইনই একটি সমাজ চিন্তার ভিত্তিতে রচিত। ইসলামী আইন অনুযায়ী প্রতিটি মুসলমানের লাশকে আনুষ্ঠানিকভাবে গোসল দিতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাফন দিতে হবে। তারপর জানাযা পড়তে হবে এবং সবকিছু করার পরই তাকে কবর দেয়া যাবে। এ সব কিছু করার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম আছে। শহীদের লাশের গোসল দেয়া বা তাকে নতুন কাপড়ে কাফন পরানোর প্রয়োজন পড়ে না। মৃত্যুর সময় তাঁর দেহে যে কাপড় ছিল সে কাপড়েই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

এ ব্যতিক্রমধর্মী নিয়মের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, শহীদের আত্মা ও ব্যক্তিত্ব উভয়ই এমন পবিত্র যে, তাঁর দেহ, রক্ত এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুই এ পবিত্রতায় সমাচ্ছন্ন। বলা হয়, শহীদের দেহ আত্মিকতায় পূর্ণ। কথাটি এ অর্থে বলা হয় যে, শহীদের আত্মার জন্য প্রযোজ্য নিয়ম-নীতি তাঁর দেহের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। শহীদের রূহ, সদগুণাবলী (নেকী) ও আত্মত্যাগের কারণে তাঁর লাশ ও পোশাক-পরিচ্ছদও হয় সম্মানার্হ। যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাত বরণ করেন তাঁকে রক্তভেজা কাপড়ে রক্তাক্ত দেহে কোন প্রকার গোসল ছাড়াই সমাহিত করা হয়।

ইসলামী আইনের উপরোক্ত বিধানসমূহ শহীদের পবিত্রতার পরিচয় বহন করে।

www.pathagar.com

শাহাদাতের পবিত্রতার ভিত্তি কি ? এটা সুস্পষ্ট যে, শুধুমাত্র নিহত হওয়ার কারণে পবিত্রতা হাসিল করা যায় না। এটা সব সময় গর্বের বিষয় নয়। অনেক মৃত্যুই হয়তো অপমানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

চলুন বিষয়টি আমরা আরো কিছুটা ব্যাখ্যা করি। আমরা জানি মৃত্যু বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন ঃ

১। স্বাভাবিক মৃত্যু ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার জীবনের স্বাভাবিক মেয়াদ শেষে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তার মৃত্যু একটি সাধারণ ঘটনা বলে মনে করা হয়। এটা কোন গৌরব বা লজ্জার বিষয় নয়। এটা এমনকি বড় বেশী দুঃখের ব্যাপারও নয়।

২। আকস্মিক মৃত্যু ঃ কোন দুর্ঘটনার কারণে অথবা বসন্ত, প্লেগ, প্রভৃতি মহামারীর দরুন বা ভূমিকম্প অথবা বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যদি কেউ মারা যায় তাহলে সেটা অকাল মৃত্যু এবং এ কারণে তা হবে দুঃখজনক।

৩। অপরাধের শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ ঃ এ ধরনের ঘটনায় এক ব্যক্তি শুধুমাত্র তার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে অথবা কোন ব্যক্তিকে তার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এ ধরনের ঘটনার অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। আমরা প্রায়ই দৈনিক পত্রিকায় কোন এক মা কর্তৃক তার শিশু সন্তানকে হত্যার সংবাদ পড়ে থাকি। স্ত্রীলোকটি তার নিজ সন্তানকে হত্যা করেছে। কারণ তার স্বামী শিশুটিকে ভালবাসতো অথচ সেই মহিলাটি চাইত তার স্বমী শুধু তাকেই ভালোবাসুক। অথবা দেখা যায় কোন এক পুরুষ কোন নারীকে হত্যা করেছে, কারণ সে নারী তার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেছে। একইভাবে আমরা ইতিহাসেও দেখি যে, এক রাজা অপর রাজার রাজ্যভুক্ত সকল শিশু সন্তানকে হত্যা করেছে যাতে ভবিষ্যতে সে দেশে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে।

এ ধরনের ঘটনায় হত্যাকারীর কাজকে জঘন্য ও নৃশংস অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বিনা কারণে নিহত ব্যক্তিকে হামলা ও অত্যাচারের শিকার বলে মনে করা হয়। এহেন হত্যাকান্ডের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া হয় ভয়াভহ ও দুঃখদায়ক। একথা সুস্পষ্ট যে, এ জাতীয় মৃত্যু মর্মান্তিক ও করুণ কিন্তু তা প্রশংসাযোগ্যও নয় বা গর্বের বিষয়ও নয়। এ সব ক্ষেত্রে ইহাও শত্রুতা ও ঘৃণাবশত মিছেমিছি একজন লোক তার প্রাণ হারায়।

৪। আত্মহত্যা ঃ এ ধরনের মৃত্যু নিজেই একটি অপরাধ, সে কারণে আত্মহত্যা হচ্ছে নিকৃষ্টমানের মৃত্যু। আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু এবং স্বীয়

www.pathagar.com

গাফলতির কারণে যারা মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হয় তারা এ পর্যায়ভুক্ত। অপরাধী ব্যক্তি দুষ্কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে তার সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

৫। শাহাদাত ঃ শাহাদাত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু, যিনি সকল ঝুঁকি এবং বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও একটি মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্য হাসিলের খাতিরে অথবা পবিত্র কুরআনের ভাষায় আল্লাহ্‌র রাহে স্বেচ্ছায় সকল বিপদ ও ঝুঁকির মোকাবিলা করেন।

শহীদী মৃত্যুর দুটি মৌলিক গুণ আছে ঃ (ক) এ মৃত্যুতে জীবন উৎসর্গ করা হয় একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে, (খ) শহীদরা সচেতনভাবে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেন। শাহাদাতের ঘটনার সাথে সাধারণত একটি অপরাধও জড়িত থাকে। যিনি অপরাধের শিকার হন তাঁর মৃত্যু পবিত্র কিন্তু তাঁর হত্যাকারীদের ক্রিয়াকান্ড হচ্ছে জঘণ্য অপরাধ।

শাহাদাত বীরোচিত ও প্রশংসনীয় কাজ, কারণ, একটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত, সচেতন ও নিঃস্বার্থ কর্মকান্ডের ফলশ্রুতি হচ্ছে এই শাহাদাত। এটিই একমাত্র মৃত্যু যা জীবনের চাইতেও বড় মহান ও পবিত্র।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, অধিকাংশ জাকির (ধর্ম প্রচারক) শাহাদাত তত্ত্ব সম্পর্কে খুব কমই বৈশ্লেষিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে থাকেন, অথচ এঁরাই কারবালার ঘটনা বর্ণনাকালে হযরত ইমাম হোসাইনকে (রাঃ) শহীদানের নেতা বলে আখ্যায়িত করেন। তারা ঘটনাবলী এমন ধারায় বর্ণনা করেন, মনে হয় তিনি (হযরত ইমাম হোসাইন) বৃথাই তাঁর জীবন দান করেছেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই ইমাম হোসাইনের জন্যে শোক প্রকাশ করেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন। তিনি ছিলেন নির্দোষ নিরীহ। তাঁরা এ জন্যে দুঃখিত যে তিনি (ইমাম) এ ক্ষমতালিপ্সু লোকের স্বার্থপরতার শিকার হয়েছিলেন। এই ক্ষমতালিপ্সু লোকটি নির্দোষ ইমামের রক্তপাত করেছিল। ব্যাপার যদি এতই সাদাসিধে হতো তাহলে আমরা হযরত ইমাম হোসাইন সম্পর্কে বলতে পারতাম যে, নির্দোষ ছিলেন অথচ তাঁর ওপর বড় অবিচার করা হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তাঁকে শহীদ নামে আখ্যায়িত করা যেতো না, শহীদানের নেতা হওয়া তো দূরের কথা।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) স্বার্থান্ধ চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন, একথা বললে সম্পূর্ণ ঘটনা বলা হয় না। এটা নিঃসন্দেহে সেই বিয়োগান্তক ঘটনার নায়কেরা তাদের স্বার্থপরতার কারণেই মারাত্মক অপরাধ করেছিল, কিন্তু ইমাম তো স্বজ্ঞানে সচেতনভাবেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা চেয়েছিল তিনি যেন আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি এর পরিণতি ভাল করেই জানতেন। সেজন্যে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সংকট সন্ধিক্ষণে নীরবতা অবলম্বন করাকে তিনি মস্ত বড় পাপ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর শাহাদাতের কাহিনী, বিশেষতঃ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এর সাক্ষী।

জিহাদ বা শহীদের দায়িত্ব

যে পবিত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শাহাদাতের পথে পরিচালিত করে বা তাকে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রেরণা যোগায়, তা ইসলামে একটি আইনে পরিণত হয়েছে। এরই নাম জিহাদ। জিহাদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা, অথবা এটা সব সময় প্রতিরক্ষামূলক না আক্রমণাত্মক, সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা এবং যদি প্রতিরক্ষামূলক হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি ব্যক্তির প্রতিরক্ষা বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে জাতীয় অধিকারের হিফাযতের মধ্যে সীমাবদ্ধ অথবা এর পরিধি কি এতই ব্যাপক যে আজাদী ও ইন্‌সাফের মতো সকল মানবিক অধিকারের সংরক্ষণ এর আওতায় পড়ে, এ সব আলোচনার সময় এখন নয়। এর সাথে প্রাসংগিক আরো কয়েকটি প্রশ্নও জড়িত আছে—যেমন তওহীদে বিশ্বাস কি মানুষের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, না অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা জিহাদ কি মৌলগতভাবেই আজাদীর অধিকারের বিরোধী, না বিরোধী নয়? এ প্রশ্নগুলোর আলোচনা একই সাথে আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ হতে পারে, যদি তা যথাস্থানে হয়।

আপাতত একথা বলাই যথেষ্ট যে, ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয় যা এ কথা বলবে যে, কেউ তোমার ডান গালে চড় দিলে তুমি তার সামনে বাম গাল পেতে দাও অথবা একথা বলবে না যে, সিজারের (রাজা) প্রাপ্য সিজারকে দাও, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আল্লাহ্‌কে দাও। অনুরূপভাবে কোন পবিত্র সামাজিক আদর্শবিহীন ধর্মও ইসলাম নয়। বা এটা এমন কোন ধর্মও নয় যা তার পবিত্র সামাজিক আদর্শ হিফাযত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তিনটি পবিত্র বিষয়ের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বিশ্বাস (ঈমান), হিযরত ও জিহাদ। আল-কুরআনে যে ধরনের মানুষের কথা আল্লাহ্‌ বলেছেন সে মানুষ ঈমানের প্রতি হবে আসক্ত এবং দুনিয়ার অন্য সবকিছুর ব্যাপারে হবে নিরাসক্ত। সে তার ঈমানের হিফাযতের জন্যেই হিজরত করে এবং সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই জিহাদ করে। আমরা যদি এ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের সকল আয়াত ও হাদীসসমূহ এখানে উল্লেখ করতে চাই তাহলে আলোচনার কলেবর

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আমরা ইমাম আলী (রাঃ)-এর 'নাহজুল বালাগা' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব পালন করছি।

ইমাম আলী (রাঃ) বলেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তাঁর বাছাই করা বান্দাদের জন্যে যে বেহেশত উন্মুক্ত রেখেছেন, জিহাদ হচ্ছে তার প্রবেশদ্বার। জিহাদ হচ্ছে ধার্মিকতার ভূষণ, আল্লাহ্র দুর্ভেদ্য বর্ম এবং নির্ভরযোগ্য ঢাল। যে কেউ এটাকে অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ্ তাকে অপমানের ভূষণ এবং দুর্দশার জামা পরিধান করাবেন।"

জিহাদ বেহেশতের একটি দরজা। কিন্তু এটা সকলের জন্যে উন্মুক্ত নয়। প্রত্যেকে এর উপযুক্ত নয়। প্রত্যেকেই মুজাহিদের মর্যাদা পেতে পারেন না। আল্লাহ্ এ দরজা তাঁর বন্ধুদের জন্যেই শুধু খোলা রেখেছেন। মুজাহিদ অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী এতো বেশী উঁচু মর্যাদার আসনে সমাসীন যে আমরা তাঁকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র বন্ধু বলে আখ্যায়িত করতে পারি না। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্র বাছাই করা মানোনীত বন্ধু। আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, বেহেশতের আটটি দরজা আছে। স্পষ্টতঃ মানুষের ভিড় এড়ানোর জন্যে এতগুলো দরজা রাখা হয়নি, কেননা পরজগতে এ ধরনের কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না। আল্লাহ্ যেভাবে সব মানুষের কর্মফল বা হিসাব তাৎক্ষণিকভাবে দেখে নিতে পারেন (যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন) তেমনি তিনি এক দরজা দিয়েই সব মানুষকে বেহেশতে দাখিল করতে পারেন। পালাক্রমে বা লাইন ধরে বেহেশতে প্রবেশ করার কোন প্রশ্নই আসে না। একইভাবে বলা যায়, এ দরজাগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যে পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। কারণ পরজগতে কোন শ্রেণীভেদ থাকবে না। সেখানে মানুষকে তার সামাজিক মর্যাদা বা পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হবে না। ঈমান, সৎকর্ম ও তাকওয়ার মাত্রানুযায়ী পরকালে মানব জাতির কর্মবিভক্তি হবে এবং বিভিন্ন গ্রুপে সাজানো হবে। প্রতিটি গ্রুপ পৃথিবীতে যতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করবে তদনুযায়ী বেহেশতে একটি দরজা পাবে। কারণ, আখেরাত হচ্ছে দুনিয়ারই স্বর্গীয় প্রতিরূপ। যে দরজা দিয়ে সকল মুজাহিদ ও শহীদ বেহেশতে প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তাদের জন্যে যে স্থানটি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ্র বাছাই করা বন্ধুদের জন্যে সংরক্ষিত স্থান। তারা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে ধন্য হবেন।

জিহাদ হচ্ছে খোদাভীরুতা বা তাকওয়ার পরিচ্ছদ। 'তাকওয়ার পরিচ্ছদ' কথাটি আল-কুরআনে সূরা আল-আরাফে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম

www.pathagar.com

আলী (রাঃ) বলেন, 'জিহাদ হচ্ছে তাকওয়ার ভূষণ। সত্যিকার পবিত্রতা বা শুদ্ধতার মধ্যেই তাকওয়া নিহিত। অর্থাৎ স্বার্থান্ধতা, অহংকার ও সচেতনতার গভীরে প্রোথিত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কলুষতার হাত থেকে মুক্তি লাভ। এ চিন্তাধারার ভিত্তিতে বলা যায় যে, একজন সত্যিকার মুজাহিদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী বা খোদাভীরু সৎব্যক্তি। তিনি পবিত্র ও শুদ্ধ। কেননা তিনি হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে অবস্থান করেন, অহংকার ও আত্মশ্লাঘার ঊর্ধ্বে থাকেন, লোভ-লালসা মুক্ত থাকেন এবং কৃপণতা পরিহার করেন। একজন মুজাহিদ হচ্ছেন সকল পবিত্রের পবিত্রতম। তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার আত্মত্যাগের পূর্ণ অনুশীলন করেন। তাঁর সামনে যে দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তা নৈতিক কলুষতামুক্ত, অপরাপর বেহেশতীদের জন্যে নির্ধারিত প্রবেশদ্বার থেকে ভিন্নতর। তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় রয়েছে। আল-কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়ঃ "যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ইতিপূর্বে তারা যা কিছু খেয়েছে সেজন্যে কোন পাপ তাদের হয়নি, যদি তারা খোদাভীরুতা অবলম্বন করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, খোদাভীরু হয় ও ঈমান আনে, পুনরায় খোদাভীরুতা অবলম্বন করে ও সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন (সূরা মায়িদা, ৯৩ আয়াত)"।

এ মহান আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে কুরআনী জ্ঞানের দু'টি মূল্যবান বক্তব্য। প্রথম বক্তব্যটি হচ্ছে—ঈমান ও তাকওয়ার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। বর্তমানে এটাই আলোচ্য বিষয়। অপর বক্তব্যটি জীবন দর্শন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত। আল-কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ঈমানদার, খোদাভীরু ও সৎকর্মশীল লোকদের জন্যে সমস্ত ভালো জিনিসগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ্র সকল নেয়ামত বা অনুগ্রহ কাজে লাগাতে পারে যদি সে প্রকৃতি নির্ধারিত বিবর্তনের পথে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়। এ পথ হচ্ছে ঈমান বা বিশ্বাস, তাকওয়া বা খোদাভীরুতা ও মনুষ্যোচিত কর্মের পথ।

মুসলিম মণীষীগণ কুরআনুল করীমের এ মহান আয়াত এবং বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থে উল্লেখিত ও গূঢ় বক্তব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাকওয়া বা খোদাভীরুতাকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেনঃ

১. সাধারণ তাকওয়া
২. অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের তাকওয়া
৩. অসাধারণ তাকওয়া

মুজাহিদদের তাকওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের তাকওয়া। তাঁরা আন্তরিকভাবে নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দেন এবং আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাকওয়ার পরিচ্ছদে তাঁরা ভূষিত হন।

www.pathagar.com

জিহাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অভেদ্য বর্ম। মুসলিম জাতি যদি জিহাদের ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়, তাহলে দুশমনের হামলা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। জিহাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য ঢাল। বর্ম পরিধান করা হয় যুদ্ধের সময়ে আত্মরক্ষার জন্যে, কিন্তু হাতে ঢাল ধারণ করা হয় দুশমনের আঘাত বা তরবারির খোঁচা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে বা প্রতিহত করার জন্যে। আঘাত প্রতিহত করার জন্যে ঢাল ব্যবহার করা হয় এবং ব্যর্থ করার জন্যে বর্ম ব্যবহার করা হয়। স্পষ্টত ইমাম আলী জিহাদকে বর্ম ও ঢাল উভয়ের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা এমন কিছু জিহাদ আছে যেগুলো প্রতিরোধমূলক। এসব জিহাদের মাধ্যমে দুশমনের হামলা ব্যাহত হয়। আর এমন কিছু জিহাদ আছে যেগুলো প্রকৃতিগতভাবেই দুশমনের আক্রমণকে রুখতে পারে এবং তাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

যে কেউ জিহাদ করাকে অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ্‌ তাকে অপমানের ভূষণ পরিধান করাবেন। যারা সংগ্রামী মনোবৃত্তি এবং অন্যায়কে প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, তারা অপমান, দুর্ভাগ্য ও অসহায়তায় নিমজ্জিত হয়। হযরত নবী করীম (দঃ) বলেন ঃ সকল কল্যাণ তরবারী এবং তার ছায়াতলে নিহিত। (তাহজিব উল আহকাম—শেখ তুছী)। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্‌ আমার অনুসারীদের সম্মানিত করেছেন তাদের ঘোড়ার খুরের জন্যে এবং তাদের তীরের লক্ষ্যের জন্যে।" এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, মুসলিম জাতি হচ্ছে শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী একটি জাতি। ইসলাম শক্তির ধর্ম। সে মুজাহিদ তৈরী করে। উইল ডুরান্ট তাঁর 'সভ্যতার ইতিহাস' নামক বইতে লিখেছেন ঃ ইসলামের মতো আর কোন ধর্মই তার অনুসারীদের শক্তির দিকে এতো বেশী আহবান জানায় নি।

অপর একটি হাদীসে দেখা যায় রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলেছেন ঃ 'যে কখনো জিহাদ করেনি এমনকি জিহাদ করার কথা চিন্তাও করেনি, সে এক ধরনের মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করবে।" জিহাদ, অথবা ন্যূনপক্ষে এতে অংশ গ্রহণ করার আকাংখা হচ্ছে ইসলামী মতবাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের প্রতি ব্যক্তির বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য এরই মাধ্যমে বিচার করা হয়। আরেকটি হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, রসুল করীম (দঃ) বলেছেন ঃ শহীদকে কবরে কোন প্রশ্ন করা হবে না। প্রিয় নবী (দঃ) বলেন, শহীদের মাথার ওপর তরবারীর ঝলকানি তাঁর পরীক্ষার জন্যে যথেষ্ট। শহীদের বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য একবার প্রমাণিত হয়ে গেলে তাঁকে আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেরই এক বিশেষ ধরনের মনোবৃত্তি ছিল। শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষাই ছিল সে মনোবৃত্তি। ইমাম আলী (রাঃ) ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নিজেই বলেনঃ "যখন কুরআন মজিদের আয়াত—মানুষ কি মনে করে যে তারা 'আমরা বিশ্বাস করি' একথা বলার কারণেই কোন পরীক্ষা ছাড়াই তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে ?" নাজিল হলো, তখন আমি নবী করীমকে(দঃ) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি জানতাম যে যতদিন তিনি (নবী দঃ) জীবিত আছেন ততদিন মুসলমানেরা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না। মহান পয়গম্বর (দঃ) বললেন যে, তাঁর ওফাতের পরে মুসলমানদের মধ্যে একটি গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। তখন আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, ওহোদ যুদ্ধের সময়ে যখন কয়েকজন নিহত হলেন এবং আমি শাহাদাত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে মনমরা হয়ে পড়েছিলাম তখন তিনি আমাকে সান্ত্বনা দান করে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে আমি শহীদ হবো। আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) এ কথার সত্যতা সমর্থন করলেন এবং আমার কাছে জানতে চাইলেন যে, সে সময়ে আমি ধৈর্য অবলম্বন করবো কিনা ? আমি জবাবে জানালাম যে, সে সময় বা উপলক্ষটি আমার জীবনে শুধু ধৈর্য ধারণ করার হবে না বরং তা হবে আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময়। অতঃপর প্রিয় নবী (দঃ) ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু বিশদ বিবরণ দান করলেন।" শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা বলতে আমরা এটাই বুঝি। ইমাম আলী (রাঃ) যদি শাহাদাত সম্পর্কে আশান্বিত না হতেন তাহলে পুরো জীবনটাই তাঁর জন্যে নিরর্থক হয়ে দাঁড়াতো।

হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম সব সময় আমাদের মুখে মুখে। তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে বলেও আমরা দাবী করি। মৌখিক স্বীকৃতি প্রকাশই যদি যথেষ্ট হতো তা হলে কেউই আমাদের চাইতে ভাল শিয়া হতো না। কিন্তু সত্যিকার শিয়া মতবাদের দাবী হচ্ছে এই যে, আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আমরা এখানে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি দিক তুলে ধরলাম মাত্র।

ইমাম আলী (রাঃ) ছাড়াও আমরা আরো অনেকের কথা জানি, যাঁরা শাহাদাতের আকাংখা পোষণ করতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহ্‌র কাছে এ জন্যে দোয়া করতেন। মহান ইমামদের কাছ থেকে আমরা যে সব দোয়া পেয়েছি তা থেকে এ সব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

পবিত্র রমযান মাসের রাতে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করে বলি, 'হে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তোমার রাহে মৃত্যুবরণ করার তওফিক দাও, তোমার বন্ধুর (ইমাম) সাথী হবার এবং শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য দান করো।'

www.pathagar.com

ইতিহাসে দেখতে পাই, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিটি মানুষ যুবক বা বৃদ্ধ, বড় বা ছোট, সবারই এ বাসনা ছিল। কোন কোন সময় হুজুর আকরাম (দঃ)-এর কাছে লোকজন এসে তাঁদের শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষার কথা বলতেন। ইসলাম আত্মহত্যার অনুমতি দেয় না। সে যুগের মুসলমানেরা জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হতে চেয়েছিলেন। তারা হযরত রসুলে করীমকে (দঃ) অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি যেন তাঁদের শাহাদাতের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন।

'সফিনাতুল বেহার' পুস্তকে খেছমা (বা খছিমা) নামক এক ব্যক্তির কাহিনী আছে। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি এবং তাঁর ছেলে উভয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা একে অপরের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। পরিশেষে লটারী করলেন। লটারীতে ছেলে জিতে গেলেন এবং যুদ্ধে যোগদান করে শহীদ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর তাঁর বাবা স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তাঁর ছেলে খুবই সুখে আছে। স্বপ্নে ছেলে তাঁর বাবাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বৃদ্ধ লোকটি হযরত নবী করীম (দঃ)-এর কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। তিনি রসুলুল্লাহ্‌কে(দঃ) বললেন, যদিও তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং এতো দুর্বল যে যুদ্ধ করার মতো গায়ের জোরও তার নেই, তবুও তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করে শহীদ হতে চান। তিনি প্রিয় নবীকে (দঃ) অনুরোধ করলেন তিনি যেন আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর (বৃদ্ধ লোকটির) আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে দোয়া করেন। মহানবী (দঃ) তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে দোয়া করলেন। মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের পরিসরে বৃদ্ধ লোকটি শুধু যে ওহোদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তা নয়, শাহাদাত হাসিলের খোশ-নসীবও তাঁর হয়েছিল।

আরেক জনের কথা। তিনি ছিলেন আমর ইবনে জামুহ্‌। তাঁর কয়েকজন ছেলে ছিল। এক পা খোঁড়া হওয়াতে ইসলামী আইন অনুযায়ী যুদ্ধে যোগদান করা থেকে তাঁর অব্যাহতি লাভের কথা। আল-কুরআনে বলা হয়েছে "খোঁড়া যদি জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে সে জন্যে কোন অপরাধ নেই" (সুরা আল ফাতাহ্‌-১৭ আয়াত)। ওহোদের যুদ্ধের সময় তাঁর সকল ছেলেই জিহাদে যোগদানের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হলেন। বৃদ্ধ বললেন, তিনিও জিহাদে অংশ গ্রহণ করে প্রাণ বিলিয়ে দিতে চান। তাঁর ছেলেরা এতে আপত্তি উত্থাপন করে তাকে বাড়ীতে অবস্থান করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বললেন, জিহাদে যোগদানের জন্যে তাঁর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু তবুও আমর পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। ছেলেরা পরিবারের বয়স্ক লোকজনদের দিয়ে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতে চাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি কোনমতেই

www.pathagar.com

তার মত পরিবর্তন করতে রাজী হলেন না। তিনি বরং রসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) নিকট গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার ছেলেরা আমাকে শহীদ হতে দিতে চায় না কেন? শাহাদাত যদি অন্যদের জন্যে ভালো হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আমার জন্যেও হবে।" হযরত নবী করীম (দঃ) তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন, তাঁরা যেন তাঁকে (বৃদ্ধকে) আর বাধা না দেয়। তিনি বললেন, 'এ মানুষটি শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা তাঁর যেমন বাধ্যতামূলক নয়, তেমনি নিষিদ্ধও নয়।" বৃদ্ধ খুশী হলেন। জিহাদের ময়দানে তাঁর এক পুত্র তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পিতা সোৎসাহে বেপরোয়া লড়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি নিহত হলেন। তাঁর এক পুত্রও নিহত হলেন।

ওহোদের ময়দান ছিল মদীনার কাছাকাছি। মুসলমানেরা সে লড়াইয়ে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে মদীনায় খবর পৌঁছল যে মুসলমানেরা পরাজিত হয়েছেন। মদীনার নারী-পুরুষ ওহোদ ময়দানের দিকে ছুটলেন। মহিলাদের মধ্যে আমর ইবনে জামুহ্‌র স্ত্রীও ছিলেন। তিনি ওহোদে পৌঁছে তার স্বামী, পুত্র ও ভাইয়ের লাশ খুঁজে বের করলেন। লাশ তিনটি একটি হৃষ্টপুষ্ট উটের পিঠে চাপিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য মদীনার জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে লাশ তিনটি সমাহিত করা। পথিমধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁর উটটি থেমে থেমে অত্যন্ত শ্লথগতিতে মদীনার দিকে চলেছে এবং বার বার ওহোদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখছে। এসময়ে আরো কয়েকজন মহিলাকে ওহোদের ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেল। তাদের মধ্যে হযরত নবী করীম (দঃ)-এর কয়েকজন স্ত্রীও শামিল ছিলেন।

জনৈকা নবী-পত্নী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোত্থেকে আসছেন। মহিলা জবাবে জানালেন যে, তিনি ওহোদ ময়দান থেকে ফিরছেন।

"আপনার উটের পিঠে কি নিয়ে যাচ্ছেন?"

"কিছুই না। এতে আছে শুধু আমার স্বামী, পুত্র ও ভাইয়ের লাশ। আমি তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাই।"

"হযরত রসূলে করীম (দঃ) কেমন আছেন?"

"আলহামদুলিল্লাহ্‌। সবকিছুই ঠিক-ঠাক আছে। প্রিয় নবী (দঃ) নিরাপদে আছেন। কাফিরদের পরিকল্পনা আল্লাহ্‌ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) যদি নিরাপদে থাকেন তাহলে অন্য কিছু নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই।"

www.pathagar.com

এরপরে মহিলাটি জানালেন, তাঁর উটটির ব্যবহার কিছুটা বেখাপ্পা ধরনের মনে হচ্ছে। সে মদীনার দিকে যেতে চায় না। যেখানে তার খাদ্য খাবার রক্ষিত আছে তার সেদিকেই যাওয়া উচিত, কিন্তু সে তা না করে ওহোদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে চায়। নবী-পত্নী বললেন, ব্যাপারটি নবী করীম (দঃ)-এর গোচরীভূত করা উচিত। তাঁরা যখন নবীর (দঃ) দরবারে হাজির হলেন তখন স্ত্রীলোকটি বললেন, "আমি এক অদ্ভুত ঘটনা বলতে চাই। এ প্রাণীটি খুবই কষ্টে-সৃষ্টে মদীনার পানে যায়, কিন্তু ওহোদের পথে চলে অনায়াসে।" হযরত মুহাম্মদ (দঃ) প্রশ্ন করলেন, "আপনার স্বামী কি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কোন কিছু বলেছিলেন ?"

মহিলাটি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, যখন তিনি ঘর থেকে বের হলেন, তখন তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ্ ! তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমি যেন এই ঘরে আর ফিরে না আসি।"

আল্লাহ্র নবী (দঃ) বললেন, "ঠিক তাই, আপনার স্বামীর দোয়া কবুল হয়েছে। এখন তাঁকে অন্য শহীদানের সাথে ওহোদ ময়দানে দাফন করা হোক।"

আমীরুল মু'মেনীন ইমাম আলী (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, "বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করার চাইতে এক হাজার তরবারীর আঘাত সহ্য করাকে আমি শ্রেয় মনে করি।"

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) যখন কারবালা ময়দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখে ছিল কিছু কবিতার পংক্তিমালা।

শোনা যায় তাঁর পিতাও মাঝে মাঝে এসব কবিতা আবৃত্তি করতেন। আমরা তাহলে সে স্মরণীয় পংক্তিমালার অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

পার্থিব বস্তুনিচয় নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক, যদিও
পরকালের প্রতিদান এর চেয়ে শ্রেয়তর নিঃসন্দেহে,
তোমার যা কিছু আছে, আছে যতো সম্পদ বৈভব,
সবই যদি থেকে যায় পশ্চাতে,
তাহলে এতো ব্যয় কুণ্ঠ হয়ে লাভ কি বলো ?
দেহের নিয়তি যদি হয় ক্ষয় আর মৃত্যুতে বিলীন,
আল্লাহ্র রাহে খণ্ড-বিখণ্ডিত হোক তোমার দেহ
তা কি নহে প্রিয়তর ?

www.pathagar.com

শহীদের প্রেষণা

শহীদের প্রেষণা সাধারণ লোকের মতো নয়, ভিন্নতর। তাঁর যুক্তি হচ্ছে সংস্কারকের অন্ধ যুক্তি এবং আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ প্রেমিকের যুক্তি। যদি উভয়ের যুক্তি, যেমন একজন খাঁটি সংস্কারক এবং একজন একান্ত উৎসাহী ও আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ প্রেমিকের যুক্তি এক সাথে মিশিয়ে ফেলা যায় তবে তার ফলাফল হবে শহীদের প্রেষণা। আসুন আমরা বিষয়টি আরও একটু বিশদভাবে বুঝতে চেষ্টা করি।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) যখন কুফা যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সে সময়ে তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য তাঁকে কুফা যাত্রা থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের বক্তব্য ঃ তাঁর কাজ যুক্তিসম্মত নয়। নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী তাঁদের কথা সঠিক ছিল। হযরত ইমাম হোসাইনের কুফা গমনের সিদ্ধান্ত তাঁদের সমর্থনযোগ্য ছিল না, কারণ তাঁদের যুক্তি ছিল পার্থিব মাপকাঠিতে জ্ঞানী বিবেচিত লোকদের যুক্তি। কিন্তু হযরত ইমামের ছিল উন্নততর যুক্তি। তাঁর ছিল শহীদের যুক্তি, যা সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস যেনোতেনো লোক ছিলেন না। হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াও কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক সাফল্য বিবেচনাই ছিল তাঁদের যুক্তির বুনিয়াদ। তাঁদের বিবেচনায় হযরত ইমাম হোসাইনের কাজে মোটেই বিচক্ষণতা ছিল না। ইবনে আববাসের প্রস্তাবটি রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তম ছিল। চালাক লোকদের অভ্যাস হচ্ছে নিজ কাজে অন্য লোকদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। তারা অন্য লোকদের সামনে ঠেলে দেয় এবং নিজেরা পেছনে থেকে যায়। অন্যেরা সফল হলে তারা তাদের কামিয়াবীর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। অন্যথা তাদের কোন ক্ষতিই হয় না। ইবনে আববাস ইমাম হোসাইনকে (রাঃ) বললেন, "কুফার জনগণ আপনাকে একথা বলার জন্যে চিঠি লিখেছেন যে, তারা আপনার জন্যে যুদ্ধ করতে রাজী। ইয়াযিদের অফিসারদের সেখান থেকে বের করে দেয়ার জন্যে তাদের কাছে আপনার চিঠি লেখা উচিত। তারা হয়ত আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে অথবা করবে না। যদি তারা আপনার কথা অনুযায়ী কাজ করে, তাহলে আপনি সেখানে নিরাপদে যেতে পারেন। আর যদি তারা তা না করে তাহলে আপনার মর্যাদা ঠিকই থাকবে।"

ইমাম এ উপদেশ মোটেই শুনলেন না। সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি কুফায় যেতে বদ্ধপরিকর। ইবনে আববাস বললেন, তাহলে আপনি নিহত হবেন।"

—তাতে কি ? ইমাম বললেন।

www.pathagar.com

"কোন ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে যে সে মারা যাবে, সে অবশ্যই স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সে সাথে নিয়ে যায় না।"

—"কিন্তু আমি অবশ্যই তাদের সাথে নিয়ে যাবো।"

শহীদের যুক্তি অনুপম। সাধারণ মানুষের বোধশক্তির বাইরে এ যুক্তি। এ কারণে শহীদ শব্দটিকে ঘিরে আছে পবিত্রতার এক অলৌকিক মহিমা। পবিত্র গৌরবমন্ডিত শব্দমালার তালিকায় শহীদ শব্দটি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বীর এবং সংস্কারক বলতে যা বুঝায়, এর ব্যঞ্জনা তার চেয়ে উচ্চতর। এর পরিবর্তে ভিন্ন কোন শব্দ ব্যবহার করা যায় না।

শহীদের খুন

শহীদ কি করেন ? দুশমনকে প্রতিহত করা এবং তা করতে গিয়ে তাকে আঘাত করা বা তার হাতে আহত হওয়ার মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপারটা যদি তাই হতো, তাহলে আমরা বলতে পারতাম শহীদের খুন বৃথাই ঝরে। কিন্তু শহীদের রক্তদান তো কখনই বৃথা যায় না। মাটির বুকে তা প্রবাহিত হয় না। প্রতিটি রক্তবিন্দু শত-সহস্র রক্তবিন্দুতে নয় বরং শত-সহস্র মণ রক্তে পরিণত হয় এবং সমাজদেহে তা পরিসঞ্চালিত হয়। একারণেই রসূল আকরাম (দঃ) বলেন, "তাঁর রাহে রক্তপাত ছাড়া আর কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে এত বেশী পছন্দনীয় নয়।" শাহাদাত হচ্ছে সমাজদেহে বিশেষতঃ রক্তশূন্যতায় ব্যাধিগস্ত সমাজদেহে রক্ত সঞ্চালন। শহীদই হচ্ছেন সে মহান ব্যক্তি যিনি সমাজের শিরায় নতুন রক্ত প্রবাহিত করেন।

শহীদের সাহস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা

শহীদের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয় তা হচ্ছে, তিনি সমগ্র পরিবেশ ও পরিমন্ডলকে সাহস ও উদ্দীপনায় মাতিয়ে তুলেন। তিনি মানুষের মাঝে বীরত্ব ও বিরোচিত সহিষ্ণুতার মনোভাব উজ্জীবিত করেন। যারা সাহসহারা, যারা উৎসাহ-উদ্দীপনা বিশেষতঃ মহান আল্লাহ্‌র কাছে আগ্রহ ও আন্তরিকতা হারিয়েছে, তাদের মাঝে সাহসের সঞ্চার করেন। তাদের মাঝে আগ্রহ ও আন্তরিকতার প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার পুনরুজ্জীবন ঘটান। এ কারণে ইসলামে শহীদের প্রয়োজন সব সময় আছে। একটা জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে সাহস এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার পুনরুজ্জীবন চাই। এটা অত্যাবশ্যক।

শহীদের অমরত্ব

একজন বিদ্বান বা মণীষী জ্ঞান দিয়ে সমাজের খিদমত করেন। জ্ঞানের কারণেই তাঁর ব্যক্তিত্ব সমাজদেহে লীন হয়ে যায়, যেভাবে পানি বিন্দু মিশে

www.pathagar.com

যায় সাগরের সাথে। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি অংশ, অর্থাৎ তাঁর মতবাদ ও চিন্তাধারা হয়ে যায় অমর। একজন উদ্ভাবক সমাজের মাঝে মিশে যান তাঁর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। তিনি তাঁর দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে সমাজের সেবা করেন, নিজে অমরত্ব লাভ করেন। একজন কবি তাঁর কাব্যকর্ম এবং একজন নৈতিকতার প্রবক্তা তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকেন।

অনুরূপভাবে একজন শহীদও তাঁর নিজস্ব পথে অমরত্ব লাভ করেন। তিনি সমাজকে দান করেন তাঁর অমূল্য রক্ত।

অন্য কথায়, জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর চিন্তাধারাকে, শিল্পী তাঁর শিল্পকে, উদ্ভাবক তাঁর আবিষ্কারকে এবং নৈতিকতার প্রবক্তা তাঁর প্রচারিত শিক্ষাকে অবিনশ্বরতা দান করেন। কিন্তু একজন শহীদ রক্ত দানের মাধ্যমে তাঁর পুরো সত্তাকে অমরত্ব দান করেন। সমাজের ধমনীতে তাঁর রক্ত প্রবাহিত হয়। সমাজের প্রতিটি শ্রেণীই তাঁদের কিছু কিছু গুণাবলীকে অবিস্মরণীয় করে রেখে যান। কিন্তু শহীদ তাঁর সমস্ত গুণাবলীর জন্যে অমর হয়ে থাকেন। এ কারণে হযরত রসুলে করীম (দঃ) বলেন, "প্রত্যেক পুণ্যের ওপরে আরেকটি পুণ্য আছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়ার চাইতে আর কোন বড় পুণ্য হতে পারে না।"

শহীদের সুপারিশ

একটি হাদীসে দেখা যায় যে, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। এরা হচ্ছেন: নবী-রসুলগণ, উলামা এবং শহীদগণ। এ হাদীসে ইমামদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু তবুও আমরা ইমামদের বর্ণনা থেকে জানতে পেরেছি যে, যেহেতু উলামা শব্দটি নিঃসন্দেহে সত্যিকার অর্থে প্রকৃত খোদাভীরু লোকদের বুঝায়, সেহেতু ইমামগণ শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে উলামাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

নবী-রসুলদের সুপারিশ করার বিষয়টি পুরোপুরি বোধগম্য। কিন্তু শহীদদের সুপারিশের ব্যাপারটি আমাদের বুঝতে হবে।

শহীদেরা সুপারিশ করার এই বিশেষ অধিকার হাসিল করেন, কারণ তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের সৎপথে পরিচালিত করেন। দুনিয়াতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঘটনার সঠিক বর্ণনা শহীদের সুপারিশের মাধ্যমে ফুটে উঠবে।

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "আল্লাহ্‌তায়ালা শেষ বিচারের দিন এমন জাঁকজমক ও জৌলুসসহকারে শহীদদের সবার সামনে

www.pathagar.com

হাজির করবেন, যা দেখে স্বর্গীয় বাহনে উপবিষ্ট নবী-রসূলগণও শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নীচে অবতরণ করবেন ঠিক এমনি শান-শওকত সহকারে শেষ বিচার দিনে শহীদান সর্বসমক্ষে উপস্থিত হবেন।"

শহীদের জন্য বিলাপ, শোক প্রকাশ

ইসলামের প্রাথমিক যুগের শহীদানদের মধ্যে হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হচ্ছেন একটি প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। "শহীদদের সরদার" —এ বিশ্লেষণে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত নবী করীম (দঃ) এর চাচা। ওহোদের যুদ্ধে তিনি শরীক হয়েছিলেন।

মদীনা শরীফ সফর করার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর কবর জিয়ারাত করেছেন।

হযরত হামজা (রাঃ) পবিত্র মক্কা নগরী থেকে মদীনা শরীফে একাকী হিজরত করেন। মদীনায় তাঁর বাড়ীতে আর কেউ ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন ওহোদ থেকে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন একমাত্র হযরত হামজা (রাঃ)-এর ঘরে ছাড়া আর সব শহীদের ঘরেই মহিলারা বিলাপ করছেন। নবী করীম (দঃ) শুধুমাত্র একটি কথা বললেন, "হামজার জন্যে বিলাপ করার কেউ নেই।" রসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সাহাবীরা তাঁদের নিজ নিজ ঘরে গিয়ে মহিলাদের ডেকে বললেন—নবী মুস্তফা (দঃ) বলেছেন--হামজার জন্যে বিলাপ করার কেউ নেই। মহিলারা তখন তাঁদের স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতাদের জন্যে রোনাজারী করছিলেন। একথা শোনার সাথে সাথেই তাঁরা প্রিয় নবী (দঃ)-এর ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে হযরত হামজা (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে তাঁর জন্যে কান্নাকাটি করলেন। এর পরে এটি একটি প্রথায় পরিণত হলো - যখনই কেউ কোন শহীদের জন্যে বিলাপ করতে ইচ্ছুক হতেন, তাহলে তিনি প্রথমে হযরত হামজা (রাঃ) এর ঘরে যেতেন এবং বিলাপ করতেন। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, যদিও সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে কান্নাকাটি করার ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহ দেয় না তবুও শহীদের মৃত্যুতে মানুষ ক্রন্দন করুক ইসলাম যেন এটাই বলতে চায়। একজন শহীদ সাহস ও শৌর্যবীর্যের আবহ সৃষ্টি করেন। কাজেই তাঁর জন্যে অশ্রুপাত করার মানেই হচ্ছে তাঁর সাহস ও শৌর্যবীর্যে শরীক হওয়া। শহীদের জন্যে রোনাজারী তাঁর শাহাদাতের জন্যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'শহীদের সরদার' উপাধি প্রথমে হযরত হামজার জন্যে ব্যবহৃত হতো। ১০ই মুহররমের বিয়োগান্ত ঘটনা ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর এ উপাধি হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর নামের সাথে যুক্ত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

কারণ তাঁর শাহাদাত অন্যসব শহীদী মৃত্যুকে ম্লান করে দিয়েছিল। এটা নিঃসন্দেহ যে এখনো এ উপাধি হযরত হামজার (রাঃ) জন্যে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তিনি তাঁর যুগের শহীদানের নেতা ছিলেন। অপর দিকে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) যুগযুগ ধরে শহীদের নেতা ছিলেন, থাকবেন, যেমনি করে হযরত মরিয়ম (আঃ) তাঁর যুগে কুমারীদের এবং হযরত ফাতিমা জাহরা (রাঃ) অনন্তকাল ধরে মহিলাদের নেত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের আগে হযরত হামজা (রাঃ)-কে শহীদানের জন্যে বিলাপ বা শোকের প্রতীক বলে গণ্য করা হতো। তাঁর জন্যে কান্নাকাটি করার মানেই হচ্ছে শহীদী চেতনার সাথে সাযুজ্য রেখে শহীদের আকাঙ্ক্ষার সাথে মিল রেখে শহীদী সাহস ও শৌর্যবীর্যে অংশ গ্রহণ। শাহাদাত বরণ করার পর থেকে ইমাম হোসাইন (রাঃ) এই স্থানেই অধিষ্ঠিত।

এখানে আমরা শহীদের জন্যে ক্রন্দন বা বিলাপের পেছনে যে দর্শন রয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

আজকাল অনেকেই হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর জন্যে বিলাপ করাকে আপত্তিকর মনে করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, ব্যাপারটি ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাধারা ও শাহাদাত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার ফসল। অধিকন্তু এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও আছে এবং শহীদের জন্যে যারা বিলাপ করেন তাদের অনগ্রসরতা ও পতনের জন্যেও দায়ী এ প্রথাই।

এ লেখকের স্মরণ আছে, ছাত্রাবস্থায় কোমে তিনি সে যুগের প্রসিদ্ধ লেখক মুহাম্মদ মাসুদের লেখা একটি বই পড়েছিলেন। এ বইতে তিনি শিয়াদের মধ্যে ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর জন্যে বিলাপ করার যে প্রথা চালু আছে তার সাথে খ্রীস্টানদের (তাদের ধারণা বিশ্বাস অনুযায়ী) যীশু খ্রীস্টের ক্রুশ বিদ্ধকরণ উৎসবের তুলনা করেছেন।

গ্রন্থকার লিখেছেন, "লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এক জাতি তাঁর শহীদের জন্যে কাঁদেন, কারণ শাহাদাত সে জাতির কাছে একটি অবাঞ্ছিত ও দুঃখজনক ঘটনা, অন্যদিকে অপর জাতি শহীদের মৃত্যুতে উৎফুল্ল হন, কেননা সে জাতির জনগোষ্ঠীর কাছে শাহাদাত হচ্ছে একটি মহান সাফল্য ও গর্বের বিষয়। কোন জাতি যদি হাজার বছর ধরে অশ্রুপাত করে শোকে হাহুতাশ করে তাহলে স্বভাবতই সে তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে, দুর্বল ও কাপুরুষ হয়ে যায়। অপরদিকে যে জাতি তাঁর বীরের শাহাদাতের ঘটনাকে বিধিসম্মতভাবে স্মরণ করে ও পালন করে, সে হয়ে ওঠে শক্তিশালী, সাহসী ও আত্মত্যাগী। এক জাতির জন্যে শাহাদাতের অর্থ ব্যর্থতা।

www.pathagar.com

এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ক্রন্দন বিলাপ, শোক-বিহ্বলতা—যা তাকে দুর্বলতা, অসহায়তা ও আত্মসমর্পণের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু অন্য এক জাতির জন্যে শাহাদাতের অর্থ হচ্ছে বিজয় ও সাফল্য এবং এ কারণে এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে আনন্দ ও উল্লাস, যা তার মনোবলকে চাঙ্গা করে তুলে।"

লেখকের সমালোচনার মৌল বক্তব্য হচ্ছে এটাই। অন্যান্য সমালোচকরাও একই ধরনের যুক্তি পেশ করেছেন। এ বিষয়টিকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই এবং প্রমাণ করতে চাই যে শহীদ স্মরণে খ্রীস্টানেরা যে উৎসব পালন করে থাকেন তা তাদের ব্যক্তিতান্ত্রিক ধারণা থেকে উদ্ভূত এবং মুসলমানেরা শহীদের যে জন্যে বিলাপ করে থাকেন তা তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভূত।

অবশ্য আমাদের জনগণের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছেন যাঁরা ইমাম হোসাইন (রাঃ) সম্পর্কে শুধু এ দৃষ্টিভংগী পোষণ করেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যার প্রতি বড় অবিচার করা হয়েছিল এবং মিছেমিছি তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা তাদের দৃষ্টিকোণ সঠিক বলে মনে করি না। এ ধরনের লোকেরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু তাঁর বীরত্বপূর্ণ প্রশংসনীয় আচরণ ও কার্যকলাপের প্রতি খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকেন। আমরা ইতিপূর্বে এ দৃষ্টিভঙ্গীর নিন্দা করেছি।

শহীদের জন্যে বিলাপ করতে ইমামেরা আমাদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন কেন তা আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই। এ প্রেরণাদান বা উদ্বুদ্ধকরণের পেছনে যে দর্শন রয়েছে আমরা তার ব্যাখ্যা দান করতে ইচ্ছুক।

যীশুখ্রীস্ট বা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শাহাদাত উপলক্ষে উৎসব পালনের অনুষ্ঠান কবে থেকে শুরু হয়েছে এবং কে তার সূচনা করেছেন তা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা একথা জানি যে ইসলাম শহীদের জন্যে বিলাপ করার পরামর্শ দিয়েছে এবং শিয়া মাযহাব অনুযায়ী এটি একটি তর্কাতীত মতবাদ।

এখন প্রধান বিষয়টি বিশ্লেষণ করার জন্যে চলুন আমরা মৃত্যু এবং শাহাদাত সম্পর্কে ব্যক্তিক ধারণা আলোচনা করি।

১. মৃত্যু কি ব্যক্তির জন্যে একটি সাফল্য অথবা অবাঞ্ছিত কোন ব্যাপার ?

২. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুকে একটি বীরোচিত কাজ বলে ধরে নেয়া উচিত।

আমরা জানি যে অতীতে এমন কতগুলো মতবাদ ছিল এবং বর্তমানেও তেমনি ধরনের মতবাদ থাকতে পারে যা বিশ্বাস করতো যে মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্ক বা অন্য কথায় দেহ ও আত্মার সম্পর্ক কয়েদীর সাথে জেলখানার

www.pathagar.com

সম্পর্কের অনুরূপ। অথবা এটাকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, এ সম্পর্ক যেন কূপে পতিত ব্যক্তির সাথে কূপের সম্পর্ক অথবা একটা পাখীর সাথে তার খাঁচার সম্পর্কের সাথে তুলনীয়। এসব মতবাদ অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু, স্বাধীনতা ও মুক্তির সমপর্যায়ভুক্ত। এ কারণে মতবাদগুলো আত্ম হত্যার অনুমতি দেয়। কথিত আছে কুখ্যাত ভূয়া নবী মানিখৈস একই মত পোষণ করতো। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, মৃত্যুর একটি নিশ্চিত পরম মূল্য আছে এবং সেটা সকলের জন্যে বাঞ্ছনীয়। কারো মৃত্যু দুঃখজনক নয়। কারো মুক্তি, কূয়া থেকে বেরিয়ে আসা এবং খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা—এসব কিছু আনন্দের, সুখের ব্যাপার, দুঃখের বা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়।

এ সম্পর্কে আরেকটি ধারণা হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে—অনস্তিত্ব পূর্ণবিনাশ ও চূড়ান্ত ধ্বংস, আর জীবন মানে হচ্ছে—অস্তিত্ব ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অপর নাম। স্পষ্টত অস্তিত্ব অনস্তিত্বের চেয়ে শ্রেয়। সহজ-প্রবৃত্তি অনুযায়ী একথা উপলব্ধি করা যায়, জীবন তার আকৃতি ও রূপ যাই হোক না কেন, মৃত্যুর চাইতে অধিকতর পছন্দনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

মশহুর সুফী কবি মৌলভী গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, জীবনের আকৃতি ও রূপ যাই হোক না কেন তিনি সকল পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে বেঁচে থাকাকে বেশী পছন্দ করেন। তিনি বলেন, এ বেঁচে থাকা যদি খচ্চরের পেট থেকে মাথা বের করে নিশ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকার মতো হয়, তবুও। এ তত্ত্ব অনুযায়ী মৃত্যুর শুধুমাত্র একটি নেতিবাচক দিক আছে।

আরেকটি মতবাদ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এবং তা হচ্ছে মৃত্যু অর্থ বিনাশ বা বিলুপ্তি নয়। এক জগত থেকে আরেক জগতে স্থানান্তর। মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্ক এবং দেহ ও আত্মার সম্পর্ককে কয়েদী ও জেলখানার মধ্যকার সম্পর্ক, কূয়ার ভেতরে পতিত ব্যক্তির সাথে কূয়ার সম্পর্ক এবং পাখী ও খাঁচার সম্পর্কের সাথে তুলনা করা যায় না। এ সম্পর্ক হচ্ছে যেন ছাত্রের সাথে তার স্কুলের এবং কৃষকের সাথে তার খামারের সম্পর্কের মতো।

এটা সত্যি যে মাঝে মধ্যে একজন ছাত্রকে তার বাড়ী-ঘর, শয়ন গৃহ থেকে দূরে চলে যেতে হয়, সেখানে সে বন্ধুবান্ধবদের পায় না। স্কুলের সীমিত পরিবেশে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হয় তাকে। কিন্তু একথা ঠিক যে সমাজে সুখী জীবন-যাপন করতে হলে তাকে সাফল্যের সাথে তার জন্যে নির্ধারিত পাঠক্রম সমাপ্ত করতে হবে। এটাও সত্যি যে একজন চাষীকে তার খামারের কাজ করার জন্যে বাড়ীঘর ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু এর পরিণতিতে সে পায় একটি উত্তম জীবিকা, সারা বছর তার সুখে কাটে পরিবারের লোকজনদের নিয়ে।

www.pathagar.com

দুনিয়া ও আখেরাত এবং দেহ ও আত্মার মধ্যে বিরাজিত সম্পর্কটাও এই ধরনের। পৃথিবী সম্পর্কে যারা এ ধরনের দৃষ্টিভংগী পোষণ করে কিন্তু অলসতা ও দুষ্কর্মের দরুণ বাস্তব জীবনে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, স্বাভাবিক-ভাবেই মৃত্যু তাদের জন্যে ভয়াবহ ও আতংকজনক। বস্তুত নারা মৃত্যুর ভয়ে ভীত, কারণ নিজেদের কর্মফলকে তারা ভয় করে।

কিন্তু যারা তাদের বাস্তব জীবনে সফলতা অর্জন করে তাদের মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই সে ছাত্রের সাথে তুলনীয় যে অধ্যয়নে আন্তরিকভাবে পূর্ণ মনযোগ নিবদ্ধ করেছে এবং যে চাষী কঠোর পরিশ্রম করেছে তার সাথেও। যে ছাত্র ও কৃষক এমনি ধরনের গুণাবলীর অধিকারী হয়, তারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনের আকাংখী হয়, কিন্তু তারা কখনো নিজেদের কাজ পেছনে অসম্পূর্ণ ফেলে রেখে যেতে চায় না।

ধার্মিক ব্যক্তিরা পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মহান ব্যক্তিবৃন্দ হচ্ছেন কামিয়াব ছাত্রদের ন্যায়। তাঁর মৃত্যুর জন্যে আকাংখা পোষণ করেন। কারণ এর অর্থ হচ্ছে পরকালীন জীবনে প্রবেশ করা। মৃত্যুর জন্যে অধৈর্য হয়ে তাঁরা প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করেন। এঁদের সম্মর্কে ইমাম আলী (রাঃ) বলেন, "আল্লাহ্ যদি তাঁদের জন্যে মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে না দিতেন তাহলে পুরস্কারের আকাংখা এবং শাস্তির ভয়ে তাঁদের আত্মা দেহের অভ্যন্তরে এক মুহূর্ত অবস্থান করতো না।"

একই সাথে একথাও বলা যায় যে, তাঁরা মৃত্যুর জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান না। কারণ তাঁরা জানেন যে, কাজ করার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হাসিল করার সুযোগ রয়েছে একমাত্র পার্থিব জীবনেই। এটা তাঁদের জানা আছে যে যত বেশী দিন বাঁচবেন ততো বেশী পূর্ণতা বা কামালিয়াততাঁরা হাসিল করতে পারবেন।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে সত্যিকার ধার্মিক পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মহান ব্যক্তিবৃন্দ একদিকে মৃত্যু তাদের কাংখিত এবং অপরদিকে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং দীর্ঘজীবন কামনা করেন—তাঁদের এ দুটি মনোভংগীর মধ্যে আদৌ কোন বিরোধ নেই।

ইহুদীরা নিজেদের আল্লাহ্র বন্ধু বলে দাবী করতো। তাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনে বলেন, "তোমরা যদি আল্লাহ্র বন্ধু হয়ে থাকো [যেমন তোমরা দাবী করছো] তাহলে মৃত্যুর আকাংখা করো।" আল্লাহ্ আরো বলেন,—তারা মৃত্যুর আকাংখা কখনো পোষণ করবে না কারণ তারা জানে যে, তারা কি করেছে এবং আখেরাতে এর কি শাস্তি তারা পাবে। এরা উপরোল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

যারা যথার্থ ধার্মিক তারা পরিস্থিতিতে দীর্ঘায়ু কামনা করা থেকে বিরত থাকেন। প্রথমত যখন তাঁরা দেখতে পান যে সৎকর্ম সম্পাদনে তারা অব্যাহত সাফল্য হাসিল করতে পারছেন না এবং তাদের ভয় হয় যে পাছে তাঁরা সামনে অগ্রসর না হয়ে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছেন। ইমাম আলী ইবনে হোসাইন (রাঃ) বলতেন: 'হে আল্লাহ্ যতদিন পর্যন্ত আমি তোমার আনুগত্য করি, অনুসরণ করি, ততদিন পর্যন্ত আমার হায়াত বাড়িয়ে দিও আর যদি তা শয়তানের চারণভূমিতে পরিণত হয়, তাহলে আমাকে তোমার কাছে তুলে নিও।"

দ্বিতীয়ত প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে শহীদী জীবন লাভের প্রার্থনা জানান। এ জন্যে কোন শর্ত তাঁরা আরোপ করেন না। কারণ এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি পুণ্যকর্ম ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। আমরা অন্যত্র প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছি যে, শাহাদাত সব চাইতে বড় পুণ্য। এ ছাড়াও শাহাদাত মানে হচ্ছে পরকালীন জগতে প্রবেশ এবং একজন প্রকৃত ধার্মিকের আকাংক্ষাও তাই।

তাইতো আমরা দেখতে পাই ইতিহাসে, ইমাম আলী (রাঃ) যখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তিনি শহীদী মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। নাহজুল বালাগাহ ও বিভিন্ন পুস্তকে ইমাম আলীর (রাঃ) এ সম্পর্কিত অনেকগুলো উক্তি পাওয়া যায়। এ কথাগুলো তিনি বলেছিলেন আহত হওয়ার পর থেকে মৃত্যুবরণ করার মধ্যবর্তী সময়কালে।

এখানে আমরা তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। এর সাথে বক্ষ্যমান আলোচনা সম্পর্কিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ্র কসম, অপ্রত্যাশিত ও অনাকাংখিত কোন কিছুই ঘটেনি। আমি যা চেয়েছিলাম তাই ঘটেছে। আমি যে শাহাদাতের আকাংক্ষা করেছিলাম তা আমি পেয়েছি। আমি ঠিক সেই ব্যক্তির মতো—যে পানির সন্ধান করছিল এবং হঠাৎ একটি কূয়া বা ঝরণার খোঁজ পেয়ে গেল। আমি সেই লোকের মতো যে আঁতিপাতি করে কোন কিছু খুঁজছিল তারপর তা পেয়ে গেল।"

১৯শে রমযানের ভোর বেলায় যখন দুশমন তাঁর মাথায় আঘাত করলো তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে প্রথম বা দ্বিতীয় যে কথাটি নিসৃত হলো তা হলো এই: "কাবার প্রভুর কসম আমি কামিয়াব হয়েছি।"

কাজেই ইসলামের দৃষ্টিভংগীতে শহীদের জন্যে শাহাদাত শুধুমাত্র একটি মহান সাফল্য ও কৃতিত্ব নয়, এটা হচ্ছে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম চরম ও পরম কামিয়াবী ও কৃতিত্ব।

www.pathagar.com

ইমাম হোসাইন (রাঃ) বলেন, "আমার নানা আমাকে বলেছেন যে, আধ্যাত্মিক জগতে আমাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হবে, তা পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু শহীদী মৃত্যু ছাড়া তা কোনক্রমেই হাসিল করা যাবে না।"

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মৃত্যু ও শাহাদাত সম্পর্কিত ব্যক্তির ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, শাহাদাতের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ শহীদের জন্যে বাস্তবিকই একটি সাফল্য ও কৃতিত্ব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, মৃত্যু নিঃসন্দেহে একটি সুখকর ঘটনা। খ্যাতনামা মণীষী ইবনে তাউস এ কারণেই বলেছেন, বিলাপ করার জন্যে আমাদের যদি হেদায়েত দেয়া না হতো, তাহলে আমি আনন্দঘন উৎসবের মাধ্যমে ইমামদের শাহাদাতের দিনগুলোকে পালন করা অধিকতর সমীচীন মনে করতাম।"

এ যুক্তিতে বলা যায় খ্রীষ্টানেরা যীশু খ্রীষ্টের শাহাদাত বরণের ঘটনাটিকে একটি উৎসব হিসেবে পালন করে ঠিকই করছে। ইসলামও শাহাদাতকে শহীদের একটি সাফল্য ও কৃতিত্ব হিসেবে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়।

কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রের অপর দিকও দেখতে হবে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে শাহাদাত হচ্ছে এমন একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার যা সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঘটে থাকে এবং তার পূর্বাপর সকল ঘটনার মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে এটি সমাজে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সে প্রতিক্রিয়া শহীদের সাফল্য বা পরাজয়ের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং শহীদ ও তার দুশমনদের অবস্থা ও মর্যাদার পৃথক পৃথক মূল্যায়নের ফলে সৃষ্ট জনমতের ওপর তা নির্ভর করে।

শাহাদাতের আরো একটি দিক গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে সমাজের সাথে শহীদের দ্বিমুখী সম্পর্ক : (ক) যারা তাঁর সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং (খ) তাদের সাথে সম্পর্ক যাদের নৈতিক বিচ্যুতির কারণে তিনি তাদের রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছিল।

এটা সুস্পষ্ট যে অনুসারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন শহীদের মৃত্যু এক বিরাট ক্ষতি। যখন তারা তাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তখন বাস্তবিকই তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্যেই কাঁদে।

যে পরিস্থিতিতে ব্যক্তি শহীদ হয় তা বিবেচনা করলে শাহাদাত একটি কাম্য বিষয়। একটি অবাঞ্ছিত ও জঘন্য বিশ্রী পরিস্থিতির কারণে শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। এদিক থেকে চিন্তা করলে শাহাদাতকে অস্ত্রোপচারের সাথে

www.pathagar.com

তুলনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এপ্যান্ডিসাইটিস ডিওডনাল বা গ্যাসট্রিক আলসার বা অনুরূপ কোন রোগের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে। অবস্থা যদি সে রকম না হয় তাহলে অস্ত্রোপচারের কাজটি যে ভুল হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শাহাদাত থেকে জনগণের শিক্ষা নেয়া উচিত ভবিষ্যতে যেন অনুরূপ ঘটনা আর না ঘটে। বিলাপ করার পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিয়োগান্তক ঘটনা মোটেই ঘটা উচিত ছিল না তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরা। শহীদ হন্তা ও জুলুমের দুর্বৃত্ত নায়কদের নিন্দা করার জন্যে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উদ্দেশ্য, এ ধরনের অপরাধীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা থেকে সমাজকে বিরত রাখা। ফলে দেখা যায় ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শোকে অশ্রু বিসর্জন করার প্রশিক্ষণ যারা লাভ করেছেন তাঁদের সাথে ইয়াযীদ ইবনে জিয়াদও সে ধরনের লোকদের ন্যূনতম সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই ঘটনার আরেকটি নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে, যখনই এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যা মানুষের কাছে ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানায়, তখন জনগণকে শহীদের মনোভাবে উজ্জীবিত হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। শহীদের জন্যে মাতম করার মানে হচ্ছে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে একাত্মতা, তার মনন ও ভাবধারার সাথে ঐক্যতান সৃষ্টি ও তার আকুলতা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান।

এখন দেখা যাক খৃীস্টানদের ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষে আমরা যেসব আনন্দ উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, নাচ এমনকি কখনো কখনো ঠাট্টা-কৌতুক, মদ্যপান ও হৈ চৈ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করি অথবা শহীদের জন্যে শোক প্রকাশ বা মাতম করি—এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি শাহাদাতের ভাবধারার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাধারণত মাতম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা রয়েছে। এটা ধরে নেয়া হয় যে বেদনা ও দুঃখ থেকেই কান্নার সৃষ্টি। সুতরাং বিষয়টি মন্দ।

হাসি ও কান্না মানুষের দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য প্রাণীরাও আনন্দ ও বেদনা অনুভব করে, সুখী ও বিষণ্ন হয়। কিন্তু তারা হাসেও না, কাঁদেও না। হাসি আর কান্না হচ্ছে তীব্র আবেগের বহিঃপ্রকাশ, এ বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র মানুষেরই আছে।

হাসিও নানা ধরনের আছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা সেটা আলোচনা করতেই চাই না। কান্নাও নানা প্রকারের। কিন্তু এটা সব সময় অনুভূতির তীব্রতা ও প্রচন্ড উত্তেজনা থেকে বের হয়ে আসে। আমরা সবাই জানি ভালবাসায়ও অশ্রু ঝরে, আকুতি থেকেও কান্না আসে। প্রেমের প্রবল

www.pathagar.com

ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যখন কেউ কাঁদে তখন সে তার প্রিয়জনের নিবিড় নৈকট্য অনুভব করে। আনন্দ ও হাসির একটা অন্তর্মুখী ক্রিয়া আছে। অপরদিকে কান্নার রয়েছে বহির্মুখী প্রকাশ। তার অর্থ হচ্ছে আত্মবিলুপ্তি ও প্রেমাস্পদের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব ও বীরোচিত মৃত্যুর কারণে হাজারো লাখো মানুষের হৃদয়ের গভীরতম আবেগকে উদ্বেলিত করেছেন। আমাদের মুবাল্লিগরা যদি ইমাম হোসাইনের মানসিকতা ও চিন্তাধারার সাথে সাধারণ মানুষের মানসিকতা ও চিন্তাধারা সমন্বয় সাধন করতে চান তাহলে তারা আবেগের এ অফুরন্ত ভান্ডারকে কাজে লাগাতে পারেন এবং সমস্ত পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন।

হযরত ইমাম হোসাইনের অমরত্বের মূল রহস্য হচ্ছে, একদিকে তাঁর আন্দোলন ছিল ন্যায়ভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর। অপর দিকে এ আন্দোলন প্রচন্ড আবেগের সৃষ্টি করেছিল। মহান ইমামবৃন্দ তাঁর (হযরত ইমাম হোসাইন রাঃ) জন্যে বিলাপ করার বিধান দিয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কারণ এ কান্না, এ বিলাপই তাঁর আন্দোলনকে জনগণের হৃদয়ে প্রোথিত করে দিয়েছে। আমরা আবারো বলছি, হায়, আমাদের মুবাল্লিগবৃন্দ যদি আবেগের দুর্মূল্য সম্পদকে ব্যবহার করতে পারতেন।

হযরত ফাতেমা জাহরা (রাঃ)-কে যখন তাঁর পিতা সে সুপরিচিত প্রার্থনা —পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন, যা আমরা সাধারণত নামাযের পরে বা রাতে শোয়ার আগে আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন করি (আল্লাহু আকবর—৩৪ বার, আলহামদুলিল্লাহ্‌—৩৩বার ও সুবহানাল্লাহ্‌—৩৩বার) তিনি তাঁর মহান দাদা হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর মাজারে গেলেন এবং তসবিহ তৈরী করার জন্যে সেখান থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করলেন। তাঁর এ কাজের তাৎপর্য কি ?

শহীদের কবর পবিত্র। তার আশেপাশের মাটিও পবিত্র। তসবীহ পড়ার জন্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর প্রয়োজন পড়েছিল তসবিহমালার। তসবিমালা কি পাথর, কাঠ বা মাটি দিয়ে তৈরী হবে, আসলে তাতে কিছু আসে যায় না। মাটি যেকোন স্থান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি (হযরত ফাতেমা রাঃ) তসবিহ ছড়ার জন্যে শহীদের মাযারের আশে পাশের মাটিই পছন্দ করেছিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাঁর এ কাজের মাধ্যমে হযরত হামজা (রাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেয়েছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত হামজার 'শহীদের সরদার' উপাধি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে তাঁর ভাইয়ের দৌহিত্রকে প্রদান করা

www.pathagar.com

হয়। এখন কেউ যদি শহীদের মাযার থেকে দোয়া নিতে চান তাহলে তাঁর উচিত হবে ইমাম হোসাইনের মকবেরা থেকে মাটি সংগ্রহ করে তসবিহমালা তৈরী করা।

আমাদের নামায আদায় করতে হয়, ইবাদত করতে হয়। একই সাথে একথাও মনে রাখতে হবে কোন কম্বল, কার্পেট অথবা খাওয়ার উপযোগী বা পরিধানযোগ্য কোন জিনিসের উপর সিজদা করা আমরা জায়েয মনে করি না। এ কারণে আমরা একখন্ড পাথর বা এক টুকরা মাটি সাথে রাখি। কিন্তু মহান ইমামেরা বলেছেন শহীদের কবর থেকে সংগৃহীত মাটির উপর সিজদা করা উত্তম। সম্ভব হলে কারবালা থেকে মাটি যোগাড় করে নিতে হবে, কারণ এ মাটি থেকে শহীদের সুঘ্রাণ ভেসে আসে। নামায পড়ার সময় আপনি যে কোন ধরনের মাটিতে সিজদা করতে পারেন, কিন্তু এজন্যে আপনি যদি এমন কোন মাটি ব্যবহার করতে পারেন যার সাথে শহীদের কিছু না কিছু সম্পর্ক ও যোগাযোগ আছে, তাহলে আপনি শতগুণ বেশী পুরস্কৃত হবেন আল্লাহ্‌র দরবারে। একজন ইমাম বলেছেন : আমার দাদা হোসাইন বিন আলী (রাঃ) এর কবরের মাটিতে সিজদা কর। কারণ যখন কোন লোক সেই পবিত্র স্থানে দোয়া ও সিজদা করে তখন সে (আকাশের) সপ্তম স্তর পর্দা ভেদ করে চলে যায়। শহীদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং তাঁর কবরের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্যে জনগণের উপর এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এর পেছনে যে চিন্তাধারা কাজ করছে তা হচ্ছে মানুষ যেন শহীদের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে এবং তাঁর কবরের মাটিকে অন্তরের সুষমা ঢেলে স্নেহ ভরে স্পর্শ করতে পারে।

আধুনিক বিশ্বে বিশেষ কোন গ্রুপ বা শ্রেণীভুক্ত মানুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্যে প্রতি বছর একটি বিশেষ দিন উৎসর্গ করা হয়। মাতৃ দিবস, শিক্ষক দিবস হচ্ছে—এ ধরনের উদাহরণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মুসলমানেরা ছাড়া অন্য কোন জাতি শহীদের স্মরণে কোন দিন উৎসর্গ করে না। শহীদ স্মরণে উৎসর্গীকৃত দিনটি হচ্ছে আশুরার দিন (১০ই মুহররম)। আশুরার রাতকে শহীদ রজনী বলা যেতে পারে।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, প্রেমিক ও সংস্কারকের যুক্তি যখন একসাথে মিলে যায় তখন সেটা হয়ে যায় শহীদের যুক্তি। একজন সংস্কারক ও একজন আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ প্রেমিকের ব্যক্তিত্ব যখন একদেহে লীন হয়ে যায় তখন সেখানে জন্ম নেয় একজন শহীদ। একজন মুসলিম বিন আওসাজা, একজন হাবিব বিন মুযাহির ও একজন জুহাইর বিন কায়েন এ প্রক্রিয়ারই বাস্তব ফসল। সে যা হোক, এটা অবিশ্যিই স্মরণ রাখতে হবে যে সব শহীদের মর্যাদা সমান নয়।

www.pathagar.com

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) আশুরার দিনে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে একটি প্রামাণিক সাক্ষ্য বিবৃতি দিয়েছেন। এ থেকে আশুরার শহীদানের উচ্চমর্যাদা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এটা জানা কথা যে ধার্মিক ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে শহীদগণ বিশেষভাবে সম্মানিত। আবার শহীদের মধ্যে আশুরার শহীদান গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর প্রামাণিক সাক্ষ্য বা বিবৃতি কি ছিল তা আপনারা জানেন কি ? যদিও তাঁর সঙ্গীদের ইতিপূর্বে যাচাই বাছাই করা হয়েছিল এবং অনুপযুক্তদের কারবালা ময়দান ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল, তবুও আশুরার রাতে তিনি শেষবারের মতো তাদের পরীক্ষা নিলেন। এবারে একজনও বাদ পড়লো না।

এ সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর নিকট তাঁবুতে পানি ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গী সাথীদের সেখানে জমায়েত করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি সে তাঁবুটি কেন বেছে নিয়েছিলেন, তার সঠিক কারণ আমরা বলতে পারবো না। মনে হয় সে রাতে কোন পানি বহনকারী থলে তাদের কাছে ছিল না। সামান্য পরিমাণ পানি তখন শুধু সে তাঁবুতেই ছিল। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর ছেলে হযরত আলী আকবরই ফোরাত নদী থেকে ঐটুকু পানি এনেছিলেন।

কারবালা যুদ্ধের নির্ভরযোগ্য কাহিনীকারেরা বলেন, ১০ই মুহররমের রাত্রে ইমাম হোসাইন (রাঃ) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর সাথে তাঁর ছেলেকে পানি আনতে পাঠালেন। তাঁদের মিশন সফল হল। তাঁরা পানি নিয়ে এলেন। উপস্থিত সবাই পানি পান করলেন। পরে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাঁদের গোসল করতে বললেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন এখন তারা যে পানি পেয়েছেন, এটাই শেষ সঞ্চয়। এরপরে আর পানি পাওয়া যাবে না। কারণ যাই হোক না কেন তিনি তাঁর সঙ্গীদের এক জায়গায় জমায়েত করলেন এবং বলে দিলেন যে, ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারেন। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় এক বলিষ্ঠ ভাষণ দান করলেন। তাঁর ভাষণে সেদিন অপরাহ্নের ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি বক্তব্য রাখলেন।

আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, শত্রুপক্ষ ৯ই মুহররম সন্ধ্যায় তাঁকে চরমপত্র প্রদান করেছিল। চরমপত্রকে সামনে রেখে ইমাম হোসাইন (রাঃ) ১০ই মুহররম সকাল বেলার মধ্যে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইমাম জয়নাল আবেদীন (রাঃ) তা জানতে পেরেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন— ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাঁর সংগী-সাথীদের একটি তাঁবুতে সমবেত করেন।

www.pathagar.com

কাছেই ছিল ইমাম জয়নাল আবেদীন (রাঃ)-এর তাঁবু। তিনি অসুস্থ হয়ে সেখানে শয্যাশায়ী ছিলেন। ইমাম হোসাইন (রাঃ) শিবিরে সমবেত সাথীদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দান করলেন। শুরুতে তিনি বলেন, "আমি মহান আল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ প্রশংসা করছি। প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর যে কোন পরিস্থিতিতে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।"

যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের পথে কদম বাড়ায়, তার জন্যে যা কিছু ঘটে, তা সবই ভালো। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পরিণতির তোয়াক্কা না করেই সকল পরিস্থিতিতে সচেতনভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করে যান।

এ প্রসংগে আমরা প্রসিদ্ধ কবি ফারাযদাকের সাথে ইমাম হোসাইনের একটি আলোচনার কথা উল্লেখ করতে পারি। ইমাম হোসাইন যখন কারবালা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন ফারাযদাকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ফারাযদাক তাঁকে ইরাকের বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। জবাবে ইমাম বললেন, 'আমাদের কাংখিত পথে যদি ঘটনাপ্রবাহ অগ্রসর হয়, তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে তাঁর সাহায্য কামনা করবো, কিন্তু অপ্রীতিকর কোন কিছু যদি ঘটে যায়, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো না, কেননা আমাদের উদ্দেশ্য সৎ এবং বিবেক নিঃসৃত। সুতরাং যা কিছুই ঘটে তা ভালো বৈ মন্দ নয়।"

"প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর যে কোন পরিস্থিতিতে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।"

তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি জীবনে সুসময় ও দুঃসময় দেখেছেন। ভালো দিনগুলো তো ছিল তাঁর শৈশবে, যখন তিনি হযরত নবী করীম (দঃ)-এর কোলে বসতেন এবং তাঁর কাঁধে চড়ে বেড়াতেন। এমন এক সময় ছিল যখন মুসলিম জাহানে তিনিই ছিলেন সবার প্রিয় শিশু। সে সব দিনের জন্যে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ। আবার আল্লাহ্‌র কাছে তিনি বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার জন্যেও কৃতজ্ঞ। কারণ যা কিছুই ঘটছে তা তাঁর (ইমাম হোসাইন) জন্যে ভালো। তিনি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছেন। যিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের আল-কুরআন পুরোপুরি বুঝার এবং ধর্মের মর্মোপলব্ধি করার তওফিক দিয়েছেন।

এসব কথা বলার পর ইমাম তাঁর সংগী-সাথী ও পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, "আমার সংগী-সাথী-দের চেয়ে উত্তম ও অধিকতর বিশ্বস্ত আর কোন সংগী-সাথী আছে বলে আমার জানা নেই অথবা আমার আত্মীয়দের চাইতে অধিকতর ধার্মিক ও বেশী কর্তব্যপরায়ণ আর কোন আত্মীয় আছে কিনা তাও জানি না।" এই ভাবেই

www.pathagar.com

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাঁর সংগী-সাথীদের এক অতি উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করলেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর যে সব সাহাবী তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করে শাহাদাত কবুল করেছিলেন এবং ইমাম আলী (রাঃ)-এর যেসব সংগী-সাথী তাঁর পাশে থেকে জামাল, সিফফিন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছিলেন তাদের তুলনায় ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাঁর সংগী-সাথীদের উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর জ্ঞাতির চাইতে অধিকতর ধার্মিক ও কর্তব্যপরায়ণ আর কেউ আছে কিনা তা তিনি জানেন না। ইমাম এভাবেই তাদের উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করলেন এবং তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "ভদ্রমণ্ডলী, আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, আমার সংগী-সাথী ও আত্মীয়-স্বজন, আপনাদের সবাইকে আমি বলতে চাই, এরা (ইয়াযিদ বাহিনী) শুধু আমার জন্যেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, আর কারো জন্যে নয়। তারা আমাকেই তাদের একমাত্র দুশমন বলে বিবেচনা করে। তারা আমার কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নিতে চায়। যদি আমাকে তারা খতম করতে পারে তাহলে আপনাদের সাথে তাদের আর কিছুই করার থাকবে না। আপনারা আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। এখন আমি আপনাদেরকে আপনাদের প্রদত্ত অঙ্গীকার থেকে রেহাই দিচ্ছি। এখানে থাকার জন্যে আপনাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন শত্রু বা মিত্র এখানে থাকার জন্যে আপনাদের বাধ্য করবে না। আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে কেউ চলে যেতে চান, যেতে পারেন।" তারপর সংগীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনারা প্রত্যেকেই আমার এক একজন আত্মীয়ের হাত ধরে এখান থেকে চলে যেতে পারেন।"

ইমাম হোসাইন (রাঃ) পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বয়স্ক লোকজন এবং নাবালকরাও শামিল ছিলেন। অধিকন্তু, তারা সবাই সেখানে অপরিচিত ছিলেন। তারা সবাই একসাথে চলে যান ইমাম তা চাননি। সে জন্যে তিনি তাঁর সংগী-সাথীদের বলেছিলেন তারা যেন প্রত্যেকে তাঁর একজন আত্মীয়ের হাত ধরে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করেন।

এ ঘটনা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর সাথীদের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করে। কোন পক্ষ থেকেই তাদের উপর জোরজবরদস্তি করা হয়নি। দুশমনেরা তাদের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করেনি। ইমাম বাধ্য-বাধ্যকতা থেকেও তাঁদের মুক্তি দিয়েছিলেন। এমনি পরিস্থিতিতে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সংগী-সাথীরা একে একে ইমামকে যে আন্তরিকতাপূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন তা ছিল স্মরণীয়।

www.pathagar.com

ইমাম খুশী হলেন

১০ই মুহররম ও তার আগের রাতে ইমাম লক্ষ্য করলেন তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজন, শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই বিশ্বস্ততার সাথে তাঁকে অনুসরণ করছেন। এটা ছিল তাঁর জন্যে সত্যিই আনন্দের ব্যাপার।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করে তিনি খুশী হলেন। তা হচ্ছে তাঁর কোন সংগীর চালচলনে দুর্বলতার কোন চিহ্ন বিন্দুমাত্রও দেখা যায়নি। তাঁরা কেউ শত্রুপক্ষে যোগদান করেননি। অপরদিকে শত্রুপক্ষের কয়েকজন সৈন্যকে তারা ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর পক্ষে টানতে পেরেছিলেন। দুশমন বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য আশুরার দিন এবং তার আগের রাতে তাঁদের পক্ষে চলে আসেন। হুর বিন ইয়াযিদ ছিলেন এঁদের অন্যতম। আশুরার রাতে সর্বমোট ৩০ জন সৈন্য ইমামের বাহিনীতে যোগদান করেন। এ সবই ইমামের জন্যে প্রীতিকর ঘটনা ছিল।

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর সংগী-সাথীরা একে একে তাঁকে বললেন, "হযরত, আপনি কি আমাদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন আপনাকে একলা ফেলে চলে যেতে? তা কখনো হতে পারে না। আপনাকে ছাড়া আমাদের জীবনের কোন মূল্যই নেই।"

একজন বললেন, আমার সাধ জাগে, আহা! আমি যদি নিহত হতাম, আমার দেহ যদি পুড়িয়ে ফেলা হতো এবং দেহের ছাইগুলো এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে দেয়া হতো। আহা! যদি ৭০ বার আমার সাথে এমন ব্যবহার করা হতো! শুধু একবার নিহত হওয়া এটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়।।"

আরেকজন বললেন, আমার সাধ হয়, আহা! আমি যদি ক্রমাগত এক হাজার বার নিহত হতাম। আহা! আমার যদি এক হাজারটি প্রাণ থাকতো, তাহলে তা সবই আপনার জন্যে কুরবানী করে দিতাম।"

সবাই একই সুরে

প্রথমেই কথা বললেন, তাঁর বিবেকবান ভাই, আবু আল-ফযল আল আব্বাস। অন্যেরা তাঁর কথার পুনরোক্তি করলেন। এটাই ছিল তাঁদের শেষ পরীক্ষা। যখন তাঁরা সবাই তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন, তখন ইমাম হোসাইন (রাঃ) আগামীকাল কি ঘটতে যাচ্ছে তা সবার সামনে প্রকাশ করে দিলেন। তিনি বললেন "আমি আপনাদের জানাচ্ছি, আপনারা সবাই আগামীকাল নিহত হবেন।" তাঁরা সবাই আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়

www.pathagar.com

করলেন। কারণ মহান আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর প্রিয়নবী (দঃ)-এর বংশধরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করার সুযোগ দিয়েছেন।

এখানে সবার জন্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। এটা যদি শহীদের যুক্তির ব্যাপার না হতো তাহলে এ কথা বলা যেতো যে, ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর তাঁবুতে তাদের অবস্থান ছিল অর্থহীন। যে কোন ভাবেই ইমাম হোসাইন যদি নিহত হন, সেজন্যে তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করবে কেন? কিন্তু দেখা গেল তবুও তারা থেকে গেলেন।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) তাদের চলে যেতে বাধ্য করেননি। তাদের সেখানে থাকা নিরর্থক, বৃথাই জীবন নষ্ট হবে, কাজেই সেখানে অবস্থান নিষিদ্ধ করা হলো—এমন কথা ইমাম তাদের কাউকে বলেন নি।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) এমন কোন কথাই বলেন নি। অপরদিকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্যে তারা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ইমাম তার প্রশংসা করেছিলেন। এতে বুঝা যায়, শহীদের যুক্তি অন্যান্যের যুক্তির মতো নয়, ভিন্ন। শহীদেরা অনেক সময় তাদের জীবন বিলিয়ে দেন, একটা উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যে, সমাজকে প্রদীপ্ত করা, তাতে প্রাণ সৃষ্টি করা এবং সমাজ দেহে রক্ত সঞ্চালনের জন্যে। এটা ছিল তেমনি এক মুহূর্ত।

দুশমনকে পরাজিত করাই শাহাদাতের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সমাজ পরিমন্ডলে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করাও এর লক্ষ্য। যদি হযরত ইমাম হোসাইনের সাথীরা সেদিন প্রাণ লুটিয়ে না দিতেন; তাহলে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি হতো কেমন করে? শাহাদাতের এ ঘটনায় যদিও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-ই ছিলেন প্রধান ব্যক্তিত্ব ও কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর সংগী-সাথীরাও এ শাহাদাতকে আরো দ্যুতিময় করে তুলেছিলেন, তাতে আরোপ করেছিলেন আরো মহনীয়তা এবং তাকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন উচ্চতর মর্যাদায়। ইমাম হোসাইন-ই শাহাদাতের শত সহস্র বছর ধরে পৃথিবীর মানুষকে আন্দোলিত করেছে, তাদের জ্ঞান দান করেছে এবং তাদের দিয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা। তাঁর এই শাহাদাত এত তাৎপর্যবহ হতোনা, এত গুরুত্ব লাভ করতো না যদি তাঁর সংগী-সাথীদের অবদান তাঁর সাথে জড়িত না হতো।

www.pathagar.com

L CENTRE OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

DHAKA, BANGLADESH.